# রংগুলোর পুনর্জন্ম হোক

[প্রকাশনীর লোগো]

# রংগুলোর পুনর্জন্ম হোক

লুবনা চর্যা

# রংগুলোর পুনর্জন্ম হোক

লেখক: লুবনা চর্যা
প্রকাশক: আরাফাতুজ্জামান আবেশ
প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০২৫
গ্রন্থস্বত্ব: আরাফাতুজ্জামান আবেশ এবং লুবনা চর্যা
প্রচ্ছদ: লুবনা চর্যা
যোগাযোগ: ৯/৯, ডিওএইচএস, মিরপুর-১২১৬, ঢাকা
ইমেইল: sales.guidancepublication@gmail.com
ওয়েবসাইট: guidancepublication.com
মোবাইল: ০১৭১১৪০৯৯৭৯

মূল্য: ৩২০ টাকা

Let the colors be reborn

A collection of Bengali poems
by Lubna Charya
First edition: February 2025
Copyright: Arafatuzzaman Abesh & Lubna Charya
Publisher: Arafatuzzaman Abesh
Cover design: Lubna Charya
Contact: 9/9, DOHS, Mirpur-1216, Dhaka
Email: sales.guidancepublication@gmail.com
Website: guidancepublication.com
Phone: 01711409979

Price: BDT 320

ISBN: 978-984-99621-8-2

## কবিতাক্রম


বসন্ত বিপ্লব ৭   ভয় ৮   চলো সুবিনয়, এখন ঘুমিয়ে পড়ি ৯
মনের মৃত্যুদিনে ১০   গন্ডার ১১   আগুনে না পুড়েও আলোকিত হওয়া যায় ১৩
প্রয়াত নদী ১৪   খ্যাপাটে প্রেমিকা ১৫   রাত গভীর হলে সমুদ্র কাছে চলে আসে ১৬
ঘড়িতে অ্যালার্ম বাজে ভালোবাসার ১৮   ডেথ মেটাল গান ১৯
হৃদয়ের আলো ২০   ঈশ্বরের কাছে চাওয়া ২১   রোবট কোকিলের গান ২২
নদীর জন্য ২৩   প্রেমিক যুবক ২৪   পাখপাখালির দিন ২৫   দৃশ্য ২৬
গাছ ২৭   কারণ আমরা একটা জঙ্গলে থাকি ২৮
নিঃসঙ্গতা আমার অটিস্টিক সন্তান ২৯
আমি একটা সাধারণ রোবট হতে চেয়েছিলাম ৩০
অভিমানপুর ৩১   পলায়নবাদী ৩২   ছোট্ট নীল পুচ্ছের মাছ ৩৩
ডানাকাটা পাখির ওড়ার স্পৃহা ৩৪   জোছনার পিদিম জ্বলা দিগন্তে ৩৫
লোকটার জন্য এলিজি ৩৬   খরগোশ ছানার পৃথিবী দর্শন ৩৭
ধর্ষণ ৩৮   ইচ্ছা করে চিপায় চাপায় ঢুকে একটু কাঁদি ৩৯
বুনো সমুদ্র ৪০   নীরব শ্রমের ব্যাংক ৪১   নৈঃশব্দ্যের মুখোমুখি ৪২
মৃত্যু ৪৩   হাত ছেড়ো না অনিরুদ্ধ ৪৪   আগুনকাব্য ৪৫
মাথা তোলো ক্রীতদাস ৪৬   শাশ্বত ৪৭   শয়তান প্রেমিক ৪৮
টাওয়ারে একটা প্যাঁচা ৪৯   স্মার্ট নাগরিক ৫০   পৃথিবীর ক্রেজি পথগুলো ৫২
নতুন ডানার আর্তধ্বনি ৫৩   হয়তো ৫৪   ফিলিস্তিন ৫৫
একটু বেশি রাত হলে রাস্তায় একা হাঁটলে ৫৬   মধ্যরাতে একপাল গরু ৫৭
ডিসেম্বরের বৃষ্টি ৫৮   ভীতু হরিণ ৫৯   তিনটা ঠেলাগাড়ি ৬০
শূন্যস্থানে যা যা হয় ৬১   অস্তিত্বহীন ক্যামেরার সামনের চরিত্ররা ৬২
ভালোবাসার বাড়ি ৬৩   বুদ্ধ ৬৪

[ফাঁকা থাকবে]

## বসন্ত বিপ্লব

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি তাপ উৎপাদনকারী চুল্লি!
তোমার ভয়াবহ উচ্চমাত্রার ফারেনহাইট আগুনে
পুড়িয়ে ফেলো নিভৃতচারী অশ্রুমালা।
অথবা বৃষ্টির দিনে মেলে দেয়া ভেজা জামার মতো
অশ্রুগুলো শুকাক চলতি বাতাসে।
বাতাসে দৃশ্যগুলো হয় ঝাপসা, ট্রেনের জানালায়
নতমুখী গাছেরা সরে সরে যায় স্মৃতির সাথে ভবিষ্যতের
গাঁটছড়া বাঁধতে বাঁধতে।
ফুলের দোকান থেকে পালায় ফুলপ্রেমিকের দল
বিষাক্ত সুবাসে ফুটো হয়ে যাওয়া হৃৎপিণ্ড নিয়ে।
বরং দল বেঁধে যাওয়া যাক ঔষধের দোকানে
কিছু পয়জনের খোঁজে। পয়জন হয়তো দেখাবে
কোনো বিরল মিষ্টি ফুলের হাসি এমন আঁধারে।
জন্মান্ধ পাখিটা রঙের ধারণা পেতে উদগ্রীব যখন
বলি, একটু ধৈর্য ধরো। একটা ঘূর্ণিঝড় এসে
সব রং কুড়িয়ে রাখবে যখন মহাকাশের ঝুড়িতে
কালো রং ছাড়া তখন বাকি থাকবে না
অন্য কোনো রঙিন আলো কণা।
তোমার অসীম কালোর খনিতে প্রজাপতি হয়ে
নাচবে রংধনুর কুমারী বর্ণকণিকা।
ঘৃণার রাজত্বে ফেরে যেভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে অভিমানী উদ্বাস্তুরা।
এই বসন্ত বিপ্লবে জোড়া কাচের চুড়ি ভেঙে
হাতে পরে রাখো একটা নিঃশব্দ চুড়ি –
রোগাক্রান্ত গাছের চেয়ে বৃক্ষহীন বন গড়া এখন জরুরি।

## ভয়

শীতের মধ্যরাতে প্রচণ্ড গরমে কেঁপে উঠি ভয়ের স্বপ্ন দেখে। তারপর আবার ঘুমাতে যাই, ফের সেই স্বপ্নটাই চলে আসে দৃষ্টির নিকটে। এমনকি ঘুম ভেঙে জেগে ওঠার পরও সেই ভয়ের স্বপ্নটাই চলতে থাকে বাস্তবের মুখোশ পরে।

চলো দূরে কোনো নির্জন রাস্তায় হাঁটি আর একটা ধূম্রশলাকা জ্বালাই। ভূত নাকি আগুন ভয় পায় – কিছুক্ষণ শলাকার আগুন জ্বেলে আমরাই বরং ভূত হয়ে ভূতকে তাড়াই।

জেনেছি গৃহে থাকে চারটা দেয়াল – আমার ঘর অসংখ্য অদৃশ্য ভয়ের দেয়াল দিয়ে তৈরি। অ্যামিবা যেমন নিজের কোষ বিভাজন করে সৃষ্টি করে আরো লক্ষ লক্ষ অ্যামিবা, ভয়গুলোও অগুনতি ভয়ের জন্ম দেয়, অগুনতি ভয় প্রজনন করে আরো বহুগুণ অগুনতি ভয়।

ভাবি, মানুষ কীভাবে এত ভয় নিয়ে বেঁচে থাকে? কিংবা মৃত্যুভয় কি ভয়ের সমুদ্রের সবচেয়ে বড় নীলতিমি, অন্যান্য ভয়গুলো যার কাছে নেহাত ছোট ছোট মাছ?

প্রতিদিন সকালে রাষ্ট্র হাসিমুখে এসে একতোড়া ফুল দিয়ে জানায় সুপ্রভাত। ফুলের তোড়াটা ছোঁয়া মাত্রই হয়ে যায় ভয়ংকর সব খবরে ঠাসা একটা নিউজপেপার। হাত থেকে সেটা ছুড়ে ফেলতেই খবরের চরিত্ররা কথা বলে ওঠে, আমার চারপাশে ঘুরে ফিরে বেড়াতে থাকে আর একে অন্যকে রক্তাক্ত করতে থাকে।

থোকা থোকা বুনোফুল ফুটে আছে নিকষ কালো আকাশে। আমি ঐ নক্ষত্রদের ঝরে পড়া সন্তান। কাঁটার বাগান হাতড়ে বেড়াই একটা ফুল দেখার প্রতিজ্ঞায়।

এই ভয় আসলে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এক ধরনের হিম অসুখ, জীবাণুর মতো যা বহন করে চলে প্রজন্মের সদস্যরা। জন্মের সময় তাই প্রতিটা শিশু পায় একটা করে শুভ্র কাফনের পোশাক। তাদের কণ্ঠ চিরতরে পেরেক ঠুকে বন্ধ করে দেয়া হয়। চোখে পরানো হয় জন্মান্ধের লোহার চশমা।

এর বিরুদ্ধে কথা বললে ও খেপে যাওয়ার ভয়। ওর বিরুদ্ধে কথা বললে এ প্রতিশোধ নেবে – এই ভয়। এমন স্বাধীন স্বাধীন কথা বললে চাকরি চলে যাওয়ার ভয়। ওখানে গেলে ধর্ষণের ভয়। সেখানে পালালে গুম হয়ে যাওয়ার ভয়। বাড়িতে থাকলে চোর ডাকাতের ভয়। বাইরে গেলে ছিনতাইকারী আর পুলিশের ভয়। পথে নামলে দুর্ঘটনার ভয়। পথ থেকে সরে দাঁড়ালে একা হয়ে যাওয়ার ভয়। মুখ খুললে চিহ্নিত হওয়ার ভয়। মুখ না খুললে বিপ্লবের শত্রু হওয়ার ভয়। একগাদা ভয়ের বারুদে ঠাসা এ অস্তিত্ব যেন এক করুণ পেটমোটা ম্যাচবাক্স। আগুনের প্রভূত সম্ভাবনা নিয়েও যে রান্নাঘরের ধুলা জমা তাকে পড়ে আছে কোনো একজন সম্ভাব্য ব্যবহারকারীর অপেক্ষায়।

## চলো সুবিনয়, এখন ঘুমিয়ে পড়ি

বাইরে ভীষণ শীত, ফুটবে না আজ কোনো ফুলের কুঁড়ি –
তুমিই তো আমার সবচেয়ে প্রিয় ফুল আর আমি বুক পেতে হই মাটি
তোমার গন্ধ পৃথিবীর সবচেয়ে সুবাসিত ফুলের চেয়েও প্রকট আর মিষ্টি
এই মিষ্টি ফুলটাকে জড়িয়ে ধরে এখন আমি ঘুমিয়ে পড়তে চাই
জেগে থাকা যখন দুঃস্বপ্ন তখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা স্বপ্নিল সিনেমা বানাই
যা বলো আর তাই বলো – আমরা তো একেকটা দুঃখের নদী, তাই না?
ঘুমের ঔষধ না, ঘুমকেই ঔষধ করে আজ বিষাদ ছোঁব না...

চলো সুবিনয়, এখন ঘুমিয়ে পড়ি
বাইরে ভীষণ শীত, ফুটবে না আজ কোনো ফুলের কুঁড়ি –
চাঁদ গেছে বাপের বাড়ি – কোটি কোটি ড্রামে চোরাচালান হয়েছে অন্ধকার
কুৎসিত হৃদয় মেলে ধরে দাঁতাল লোকগুলো হাসে
কিন্তু আমাদের ভালোবাসা খুব খুব জরুরি।
তাদের বহুকাল পরিষ্কার না করা চশমার কাচে দেখা দেয় না দেবদূত
সকল ঘটনা তারা ব্যাখ্যা করে নিজস্ব ঘোলাটে অভ্যাসে –
চলো সুবিনয়, এখন ঘুমিয়ে পড়ি
বাইরে ভীষণ শীত, ফুটবে না আজ কোনো ফুলের কুঁড়ি –
তোমার উষ্ণতা ফোটাবে আমাকে আর আমার মমতা তোমাকে
বাস্তবতার রোগাক্রান্ত আঙুরলতা হতে দুইটা পাখি ঘুম হয়ে পালাবে।

## মনের মৃত্যুদিনে

সবাই শুধু জানতে চায়, আমি খাইছি কি না। কিংবা না খেলে কখন খাব। কিন্তু কেউ জানতে চায় না, আমার মন অভুক্ত আছে কি না। তাকে নিয়মিত খাবার দেওয়া হচ্ছে কি না। খাবারের অভাবে সে মুমূর্ষু হয়ে পড়ছে কি না। আমি দেখেছি শরীর নিয়েই সবাই চিন্তিত হয় বেশি। যেমন কারো শরীর খারাপ করলে দল বেঁধে মানুষজন ফল নিয়ে তাকে দেখতে যায়। কিন্তু কারো প্রচণ্ড মন খারাপ হলে একগুচ্ছ ফুল হাতে দরজায় দাঁড়াতে কাউকে তো দেখি নাই। কারণ হয়তো দেহ বেচা যায়, দেহের বাজারমূল্য আছে। মন তো আর বেচা যায় না। মনের প্রসাধনীও কিনতে পাওয়া যায় না। রমরমা ব্যবসা, বিজ্ঞাপনের পসরা – এসবও নাই। জম্পেশ শহরে দেহ ফেলে মন লুকিয়ে পালিয়ে গেছে গেরুয়া বসন পরে। ভালোবাসার নামে দেহের স্বৈরাচারী অন্যায় আচরণ আর সে মানতে পারেনি। একটু ভালো থাকার জন্য কাঙাল মনটা ক্ষতবিক্ষত হয়েই শেষে ফিরে গেছে চেনাজানা মেঠোপথে।

রাশি রাশি উজ্জ্বল তারকারাজির মধ্যে যে তারাটা আলগোছে খসে যায়, কেউ না জানে জানুক আমি জানি – এ তোমার অভিমানী মনের শেষ নিঃসরণ। তোমার দেহবিয়োগের ঘটনায় আমাকে কোথাও খুঁজে পাবে না, কিন্তু বন্ধু আমি তোমার মনের মৃত্যুর খবরে ঠিকই এসে উপস্থিত হব কালো শাড়ি পরে কয়েকটা তীব্র সুগন্ধি দোলনচাঁপা হাতে শেষ বিকেলের আঙিনায়।

## গন্ডার

আমি আমার হৃদয়ের চির অন্ধকার দেয়াল কেটে
একটা জানালা বানাতে চেয়েছি। সেই জানালা দিয়ে
তোমার বাড়ির মরিচা ধরা বন্ধ জানালাকে কিছু বলতে চেয়েছি।
কিন্তু ঘরে রাখা একমাত্র ছুরিটা ছিল ভোঁতা –
বনের নিকষ সবুজ ফুঁড়ে একটা শিংহীন গন্ডার বেরিয়ে এসে মারে গুঁতা।

একাকিত্বের হিমবাহ হাড়ে জমে জমে তোমাকে দেখাচ্ছিল
অসহায়। তোমার দরকার ছিল গ্রীষ্মের সমুদ্রতটে অপূর্ব সূর্যস্নান।
কিন্তু দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত পশুর চোখের মতো
সূর্যের শরীরে নেমে আসছিল মৃত্যুর হিম বিভোরতা –
বনের নিকষ সবুজ ফুঁড়ে একটা শিংহীন গন্ডার বেরিয়ে এসে মারে গুঁতা।

একটা প্রেমের ছবি আঁকব বলে আমি প্রেমের কাছে চেয়েছি
কিছুটা পূর্ণতার উৎসাহী রং। কিন্তু পূর্ণতা আসার আগেই প্রেম
বহুরূপী গিরগিটির মতন বদলে ফেলেছিল নিজের ঢং।
আমি আর সময় শুকনো তুলি হাতে বোকার মতো দেখে যাই জীবনের বিবর্ণতা –
বনের নিকষ সবুজ ফুঁড়ে একটা শিংহীন গন্ডার বেরিয়ে এসে মারে গুঁতা।

অসামাজিক আখ্যা দিয়ে কেউ তোমার নিঃসঙ্গতার স্বাধীনতাকে
পাঠাতে চেয়েছিল নির্বাসনে। কমিউনিকেশন দানবের বিকট শব্দে
চমক ভাঙে স্তব্ধ নক্ষত্রপুঞ্জের। মাটির সাথে যোগসূত্র রাখার প্রয়োজনে
ঝাঁকে ঝাঁকে তারা ঝরে শূন্য নদীতে ডুবিয়ে পায়ের পাতা –
বনের নিকষ সবুজ ফুঁড়ে একটা শিংহীন গন্ডার বেরিয়ে এসে মারে গুঁতা।

খর রোদে কারো পিস্তল থেকে একটা অবাধ্য গুলি ডাঁশ মাছির মতো
ভনভন করতে করতে বিঁধে গিয়েছিল এক আগন্তুকের বুক বরাবর,
যেখানে বিশ্রাম নিচ্ছিল তার শুশ্রূষার ঠিকানা। রাস্তা জুড়ে
টমেটোর সসের মতো ঘন রক্তের ধারা জানায় এ অসুখের জরুরি বার্তা –
বনের নিকষ সবুজ ফুঁড়ে একটা শিংহীন গন্ডার বেরিয়ে এসে মারে গুঁতা।

পাহাড়ের পথ বেয়ে উঠে আসছিল কিশোরী চাঁদ। কিছু কালো মেঘ
মুখ চেপে তাকে নিয়ে যায় আকাশের সৈন্য রেখায়।
ঘুম ঘুম চোখে এই দৃশ্য দেখে বুনোফুলের বাগান। পৃথিবীর সব পাখি
তখন একটাই গান গায় একসাথে, যে গানের নাম হলো নীরবতা –

বনের নিকষ সবুজ ফুঁড়ে একটা শিংহীন গন্ডার বেরিয়ে এসে মারে গুঁতা।

বহু বহু জন্মের আয়ু পেরিয়ে আমরা তৃষ্ণার্ত ছিলাম একটা
যুদ্ধবিহীন দিনের জন্য। জোছনার চাদর বিছিয়ে ছাদে বসে ছিলাম
বাসন্তী ফুলের মদ আর ঘাসফড়িঙের কাবাব নিয়ে। হঠাৎ দূরে
নৈঃশব্দ্য ভাঙে গ্রেনেড। আপাদমস্তক ব্যান্ডেজের মতো করে খবরের কাগজ
মুড়িয়ে আসে এক অ্যাঞ্জেল, বোমায় উড়ে গেছে তার মাথা –
বনের নিকষ সবুজ ফুঁড়ে একটা শিংহীন গন্ডার বেরিয়ে এসে মারে গুঁতা।

## আগুনে না পুড়েও আলোকিত হওয়া যায়

উত্তপ্ত মোমবাতির গায়ে সেঁটে থাকা পতঙ্গ –
সরে যাওয়া উচিত ভেবেও যার আর সরা হয় না
আগুনের সহবাস ছেড়ে, তারপর অবশ্যম্ভাবীরূপে
ডানা পোড়ে। তারপরও আগুনের মায়া ছেড়ে
সে দূরে যেতে পারে না – আস্তে আস্তে দেহ পোড়ে...
আগুন শুধু মোমের পুতুল না, পোড়ায় পাথরের মূর্তিও।
হৃদয়কে কিছু ফুল এনে দেবে বলে কথা দিয়ে পৃথিবী
তার জন্য এনেছিল কান্না জমানোর কাচের বাক্স।
হারানোর ভয় পাখির শরীরে বহনকারী এক অদৃশ্য খাঁচা –
মহাকাশটা উপহার পেয়েও যে নিজের জন্য কেটে নেয়
এক খাঁচা পরিমাণ আকাশ মাত্র। শুধু হৃদয়ের ক্রীতদাস
হবে বলে কুমারী জোয়াল কাঁধে হামাগুড়ি দেয়
কোটি কোটি পিষ্ট হওয়া লাল গোলাপের রক্তে পিচ্ছিল পথে।
সবকিছু শান্ত হলে শান্তিবুড়ির মতো চাঁদ কপালে উঠে বলে:
এই দেখো! আগুনে না পুড়েও আলোকিত হওয়া যায়।

## প্রয়াত নদী

নাগরিক মরুভূমির এ বিশুষ্ক রাতে
জিভ ঝোলা কুকুরের মতন হাঁপাতে হাঁপাতে
স্মৃতির হিমাগার থেকে ডাউনলোড করি
একটা আপন নদী। পৃথিবীর অন্ধকার গোরস্তানে
চাঁদের মতো চকমকে তার বুনো শরীর।
অন্ধ মেয়ে দেয়ালে আঁকে যেই নিরালা নদী –
সুড়ঙ্গ কেটে কোনোদিন নদীটা এখানে আসবে কি?
ভরা মদের গ্লাস বারের টেবিলে
নিজেকে পরিচয় দেয় প্রমত্ত নদী বলে।
আর পানির বোতল ধরে আছে সমুদ্রের ছদ্মবেশ।
কোথাও জলাশয় নেই এই পোড়া শহরে
সুইমিংপুল ভরে আছে রাসায়নিক পানিতে।
মানুষের চোখের জলজ ব্যাংকেও জমা নেই এক ফোঁটা অশ্রু –
দূর মেঘ থেকে বৃষ্টি পাঠায়নি কোনো ধারালো চুমু।
শুধুই উচ্চাশার সূর্য – ডাকাতের চ্যালাব্যালারা
লুট করে নিয়ে গেছে আগাম কান্নার আর্দ্রতা।

আমি তোমাকে মিস করি ছোট্টবেলার নদী
ইচ্ছা করে আবার তোমার সাথে একটু গল্প করি...

শুকনো বেসিন বহুকাল পায়নি জলের ছোঁয়া
রক্তমাখা হাত না ধুয়েই প্রেমিক ফুলের তোড়া
এগিয়ে দিয়েছে প্রেমিকার হাতে।
নদীর নূপুর পায়ের শব্দ শুনি নিজেরই রক্তপ্রবাহে।
ফুটপাতে অচেনা গ্রাম থেকে আসা স্বপ্নগ্রস্ত মানুষ
বালিশ নেই তাই মাথা রাখে পুরোনো নদীটার শিয়রে।
মরুভূমি বাতাস এসে শুষে নেয় ঘুমন্ত দীর্ঘশ্বাস।
তারা ভাবে নদীর কাছে ফিরেই ছাড়বে শেষ নিঃশ্বাস।
কিন্তু নদী নিজেই শ্বাসকষ্টে ভুগে ভুগে
ইনহেলার নিয়ে পড়ে আছে অবহেলার হসপিটালে।
যখনই আমরা একসাথে থাকি, আমাদের মাঝখানে
না জন্ম নেয়া শিশু হয়ে একটা নদী শুয়ে থাকে।

আমি তোমাকে মিস করি ছোট্টবেলার নদী
ইচ্ছা করে আবার তোমার সাথে একটু গল্প করি...

## খ্যাপাটে প্রেমিকা

আমি এক ভয়াবহ উন্মাদ, অন্ধ প্রেমিকা – আর আমার
প্রেমিকের নাম অমর মেশিন। তার ধাতব দাঁত, মস্তিষ্কের নাটবল্টু,
শক্ত চোয়াল আমার খুব খুব পছন্দ। যখন সে বিকল হয়ে যায়
আমি ডাকি: ডাক্তার! ডাক্তার!! প্লিজ দেখে যাও
আমার প্রেমিকের কী হাল, কেন করছে ছটফট?
ডাক্তার! ডাক্তার!! আমাকেও দাও মেশিন হওয়ার মহাঔষধ –
যাতে ওর হৃদয়হীন বেঁচে থাকায় হতে পারি যোগ্য পার্টনার
ওহ ডাক্তার... কসাই ডাক্তার...

আমি এক খ্যাপাটে, নির্লজ্জ, রসাতলে যাওয়া প্রেমিকা –
আমার প্রেমিক এক উচ্চবংশীয়, সুপুরুষ রোবট।
তার গায়ের যান্ত্রিক গন্ধ, হাঁটাচলার পরিমিত ছন্দ
আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। যখন ওর চার্জ ফুরিয়ে যায়
ঝিমায় কোনো ভবঘুরে নেশাগ্রস্তের মতন আর ওর দুর্বল
পিটপিটে চোখে কাঁপে উৎসুক আকাশ। তখন আমি কণ্ঠনালীর
সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে চিৎকার করি: ডাক্তার! ডাক্তার!!
আমার আয়ু দিয়ে বাঁচাও আমার রোবটকে। নয়তো আমাকেও
দাও এমন আশ্চর্য ঔষধ, যাতে মানুষের হৃদয়ের সব রংধনু
রঙের অসুখ অগ্রাহ্য করে হতে পারি হৃদয়হীন নির্ঝঞ্ঝাট রোবট পরিবার।
ওহ ডাক্তার... গর্দভ ডাক্তার...

আমি এক দুর্ধর্ষ, নাছোড়বান্দা প্রেমিকা –
আমার প্রেমিককে সবাই আদর করে ডাকে পাথর।
তার স্পর্শে ফুটে ওঠে নিষ্প্রাণ প্লাস্টিক ফুলের বাগান
তার কণ্ঠে বাজে লোহা, সীসা, ইস্পাতের গান – তার আকার যেন
সৃষ্টির আনাড়িপনা। রঙের বাক্সে তার রং আলাদা করে চেনাই যায় না
সে ভালোবাসে পৃথিবীর এক কোণে ঈশ্বরের ভাঙা আয়না হয়ে
পড়ে থাকতে। আর আমি ভালোবাসি সেই আয়নাকে
নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়ে প্রেমে পড়াতে। আমার অভিসন্ধি বুঝে
বাতাসের ছুরিই ভাস্কর হয়ে অনুভূতিহীন পাথরটাকে
দিল হৃদয়ের আকৃতি। আর পাথর আক্রোশে নিজের কোমল হৃদয়ে
পাথর ঠুকে বলে: ডাক্তার! ডাক্তার!! আমাকে বাঁচাতে হলে
এই হৃদয় নামক বর্জ্যটা অপসারণ করা আগে দরকার।
তোর মরা পোয়াতি বউয়ের পেটের জ্যান্ত শিশুর দিব্যি লাগে –
ডাক্তার... ডাক্তার... ওহ পিশাচ ডাক্তার...

## রাত গভীর হলে সমুদ্র কাছে চলে আসে

রাত গভীর হলে সমুদ্র কাছে চলে আসে –
অন্ধকারের আবাস থেকে নেচে ওঠে চুড়ি হাতে
পেলব ঝাউপাতা। গাংচিল হেঁটে বেড়ায় ঘরের মেঝেতে
যেন আমি নেই এখানে। ড্রেসিং টেবিলে রাখা শঙ্খটা
গর্জন করে অবিকল সমুদ্রের স্বরে। রাত গভীর হলে
আমার বিছানা ভেসে যায় সামুদ্রিক জোয়ারের টানে।
লখিন্দরের মতো ভাসতে ভাসতে দেখি
গভীর জলে ঝরে খসে যাওয়া তারা।
তারই ছিটকে পড়া ঢেউয়ে ভেজে শিথানের বালিশ।
হাত দিয়ে বুঝি, নাহ... এ তো তোমার কান্না!

আমার বালিশ থেকে বহুদূরের এক বদ্ধ, গুমোট ঘরে
হাঁসফাঁস করছ তুমি অন্য একটা বালিশে মাথা রেখে।
আমাদের বালিশগুলো মিস করে পরস্পরকে –
আর সমুদ্র মিস করে আমাদের দুজনকে একসাথে।

অনর্থক এক ধাতব কম্পাসের স্ক্রুতে আঁটসাঁট হয়ে
পেন্সিলের বদলে ঘুরে যায় এ দেহ বৃত্ত হয়ে
ভালোবাসতে না জানা সাদা কাগজে।
কারখানার ধোঁয়া যেন আমাদের নিঃশ্বাস, পুড়ে যাই
হৃদয়ের শীতলতায়। এই রাতে নাইটগার্ডের হুইসেলে
জেগে ওঠা কুকুর আর মানুষের চোখে
একই বিস্ময়হীনতার নির্বাক বিস্ময়।
রাস্তার উপর পাঁড় মাতালের বমির আলপনা থেকে
গজিয়ে ওঠে শহর ছেড়ে পালানোর জোড়া জোড়া ডানা।
শয়তানের কারখানা থেকে কিনে আনি ছুরি
বৃষ্টিহীনতাকে উপহার দিতে কয়েক ফোঁটা রক্তবৃষ্টি।
সেই ধাতব কম্পাসের স্ক্রুতে আঁটসাঁট হয়ে আমি
নিজের পথে কেবলই ঘুরতে ঘুরতে ভুলে গিয়েছি
তোমার কাছে পৌঁছাবার কক্ষপথ।

ঘুম থেকে উঠে চোখ ডলতে ডলতে কোনো ভবঘুরে
পর্যটক বাসের পেটে খাদ্য হয়ে চালান হব
সাগরের কিনারে। আমাদের খাদ্য হবে সতেজ বাতাস

আর নগরযন্ত্রণামুক্ত জীবনের আশ্বাস।
মোমের শিখা জ্বেলে ক্লান্ত চাতালে ঘুমিয়ে পড়ি অজান্তে –
যাতে সমুদ্রে যাওয়ার স্বপ্নগুলো দেখা যায় আরো স্পষ্ট করে।

সমুদ্রের বিশাল আয়নার সামনে আমরা নগ্ন হব
ঠিক তখনই বাতাসও ষড়যন্ত্র করে হবে প্রচণ্ড শীতল।
আমি তোমার জন্য হব উষ্ণ পোশাক, তুমি হয়ো আমার।
এতদূর থেকে এত কষ্ট করে গিয়ে ডুবাব না পা অতল জলে
সমুদ্রই বরং ডুবে যাবে আমাদের প্রেমের গভীর নীলে।

## ঘড়িতে অ্যালার্ম বাজে ভালোবাসার

অনেক উঁচু কোনো পাহাড় থেকে পড়তে পড়তে পড়তে পড়তে
যখন সে পেয়ে গেল পদতলে মাটির স্পর্শ
তখনই শেষ হলো পুরোনো ইতিকথার। কেননা
পতনের পরে আর থাকে না পতনের আতঙ্ক।
নিহত বৃষ্টি শুয়ে আছে মাটিতে সটান।
মৃত্যুর পর সে পৌরাণিক কিশোরী হয়ে দেখতে লাগল
বৃক্ষের সংসার, প্রজাপতির অতিথি আপ্যায়ন।
পানকৌড়ি উড়ে এসে জুড়ে বসে পদ্মপুকুরে –
দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে বিধ্বস্ত সৈনিক
যেমন তার মাথাটা রাখে নিজের ঘরে, প্রিয় বালিশে...

ঘড়িতে অ্যালার্ম বাজে ভালোবাসার।

## ডেথ মেটাল গান

আমি ভালোবাসি শুনতে মৃত্যুর বদখত, কর্কশ অট্টহাসি –
তার সুরেলা ললিত কণ্ঠে শুয়োরের নালিশের মতন গান
আমার খুবই প্রিয়। তার চলার ভঙ্গি যেন গরিমাময় রাজহাঁসের
বাঁকানো গ্রীবা কোনো এক রক্তিম বর্ণের পুকুরে।
বুড়ি ডাইনির মতো তার রূপের জেল্লায় আমি এক
অতি নগণ্য পতঙ্গ শ্রেণির প্রেমিকা।

এত খবর উপচে পড়ে রোজ তোমার নিখোঁজ হওয়ার
খবরবিহীন সময়ের প্রেসমেশিন মগজ হতে –
এত খবর রুদ্ধশ্বাসে বলে যায় মানুষের চেয়ে জীবন্ত টিভি চ্যানেল।
রেডিওতে কান পেতে দূর গ্রামের ছায়ায় বসে
তুমি শোনো কোনো মানবিক মড়কের বেঁচে ওঠার সংবাদ?
আমিও তোমার মতো জন্ম নেয়ার আগেই আমার
কুমারী মায়ের পেটের দেয়ালে পেতে আছি কান
শুনব বলে যুদ্ধ, রক্ত, হত্যা, গুম আর অপমৃত্যুর ডেথ মেটাল গান।

কেননা মৃত্যু আমার প্রেমিকের হাতের ফুলের তোড়ার ভিতরে
লুকানো বিরহকাতর চিঠি –
কোনোদিনও দেখা না হওয়া আমরা দুজন যমজ ভাইবোন।
ফুটপাতে শীতের রাতে ন্যাংটা বালককে জড়িয়ে ধরে
ঘুমানো কুকুরের মতন আমরা সবচেয়ে কাছের বন্ধুমন।
তার সাইকেলের শব্দ পেয়ে আমি ছুটে গিয়ে লেজ নাড়ি
আর আহ্লাদী অভিমানে চাটি তার হ্যান্ডসাম কঙ্কাল।

এই ঘন অন্ধকার মানুষের বনে জুয়াড়ি
পেতে রেখেছে নিশানা, বাঘ হরিণ খেলতে খেলতে নীরবে
কেউ না কেউ হবেই বলিদান। রাত গভীর হলে
তারার আলোয় যত ফুল ফোটে পৃথিবীর অব্যক্ত মাটিতে
তার চেয়ে বেশি ফলে মৃত্যুময়তার সমৃদ্ধ বাগান।
আমিও তাই জন্ম নেয়ার আগেই আমার
কুমারী মায়ের পেটের দেয়ালে পেতে আছি কান
শুনব বলে যুদ্ধ, রক্ত, হত্যা, গুম আর অপমৃত্যুর ডেথ মেটাল গান।
যেভাবে শঙ্খ শোনে সমুদ্রের জলে ঢেউয়ের ডুবে যাওয়ার আওয়াজ।

# হৃদয়ের আলো

এইখানে এক নিঃসঙ্গ গোরস্তানে হৃদয়ে আলো জ্বেলে আমি করতে চাচ্ছি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ। যদি কোনো মুখোশ বহনকারী অন্ধ জাহাজ আলো আর ধোঁয়া দেখে করতে আসে বিপদে উদ্ধার। আমার মতো শত শত জোনাকির আলো মহাকালের চোরাস্রোতে ছড়িয়ে পড়ছে – যে আলোকণাগুলো আসলে মানুষের অতৃপ্ত হৃদয়ের জিভ। এত আলোর মশালে অন্ধ হয়ে কেউ আর দেখতে পাচ্ছে না। যাকে সে দেখতে চেয়েছে জন্মেরও আগে হতে, চোখের সামনে সে বসন্তের গান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
আমাকে ভালোবেসে জড়িয়ে ধরতে গেলে আমারই কাঁটার আঘাতে তুমি রক্তাক্ত হয়ে যাও। চুমু খেতে গেলে আমি ভ্যাম্পায়ার হয়ে শুষে নিই তোমার শেষ রক্তবিন্দুর লালিমা। আমাদের প্রেম বিরোধের উল্লাসে পায় মিলনের শাশ্বত অভ্যর্থনা।
সূর্যের আঁচে গলে এক বিষাক্ত পাহাড়ি নদী বয়ে যায় পুরোনো উপত্যকায়। তৃষ্ণায় উন্মাদ হয়ে তুমি খেয়ে নাও সেই বিষ পানির চেয়েও আপন জেনে। সেই নদীর দুই পাড়ে জোছনার আদরে পড়ে থাকে গরলখেকো পাখি, পতঙ্গ আর প্রাণীদের লাশ। নিঃশব্দে বিলাপ করে ওঠে বন্দি আকাশ। কুয়াশার আবরণে তারা খসে পড়ে মৃত্যুর মতো ঠান্ডা, করুণ বাতাসের টানে। সেই বিষাক্ত নদীর ছদ্মবেশে আমাদের মগজের অসীম ইঞ্চি এলইডি টিভি-তে প্রেম এসে বিজ্ঞাপন দেয়।
আমি জানি আমাকেই তোমার খুব দরকার। তুমিও জানো তোমার জন্যই অন্তিম অপেক্ষা আমার। তবু দুষ্টু সভ্যতার মূর্তির অগুনতি হাত রেডি হয়ে থাকে ঘটাতে ব্যাঘাত। আমাদেরকে কাছে আনতে পারে কেবল প্রাচীন সরলতার সমাজ।
আমার মতোই একাকী একটা হাতঘড়ি। আমি তাকে মাঝে মাঝে পরি। নয়তো ডাউন হয়ে যেতে পারে ব্যাটারি। মানুষের হৃদয়গুলো ঐ ডাউন হয়ে যাওয়া ব্যাটারির ঘড়ি হয়ে মৃদুস্বরে টিক টিক করে শোনাচ্ছে মুমূর্ষু যান্ত্রিক জীবনের বয়ান।
মাটি ভেবে যার উপরে গড়ে উঠছে শপিং মল, রেডিও-টিভির চ্যানেল, রেস্টুরেন্ট, হিপ হপ বার, এয়ারপোর্ট, বহুতল আবাসন – সে হলো আদতে এই সময়ের হাত পা মেলে শুয়ে থাকা রোগাক্রান্ত হৃৎপিণ্ড। তারই নালিকাকার গুহার পথে ফ্যাশন শো'তে সাদা ছড়ি হাতে ক্যাটওয়াক করে এই গ্রহের সবচেয়ে সৌন্দর্য সচেতন কতিপয় জন্মান্ধ মডেল। বিকল হৃৎপিণ্ড এভাবে তারা ঢেকে রাখে সিল্ক, পশমী আর চড়ামূল্যের জিন্সের কাপড়ে।
এইখানে এক নিঃসঙ্গ গোরস্তানে হৃদয়ে আলো জ্বেলে আমি করতে চাচ্ছি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ। তুমিও তোমার হৃদয়ের আলো জ্বেলে চেষ্টা করছ আমাকে পাঠাতে সংকেত। যদি কোনো মুখোশ বহনকারী অন্ধ জাহাজ আলো আর ধোঁয়া দেখে করতে আসে বিপদে উদ্ধার। কিন্তু অন্ধ জাহাজ শুধু অন্ধ না, বোবা এবং কালাও। আমাদের চিৎকারকে সে কোনো বন্য প্রাণীর শীৎকার ভেবে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে শূন্য দ্রাঘিমায়। শুধু এক মৃত্যু রঙের পাংশু ঈগলই আসে আমাদেরকে করতে অশেষ উদ্ধার...

## ঈশ্বরের কাছে চাওয়া

ঈশ্বর! আমার কিছু টাকা দরকার। তুমি একজন অ্যাঞ্জেলকে পাঠাও। সে এসে টাকা দিয়ে আর একটা গান শুনিয়ে যাক। না হয় এমন বৃষ্টি দাও বিনা মেঘে – যে বৃষ্টিতে ঝুপঝাপ ঝরে সোনার মোহর।

সেই টাকা দিয়ে আমি নান্দোস-এ খাব না। বেড়াতে যাব না সেন্ট মার্টিনস। করব না কোনো এক্সিবিশন মগজের খোঁড়লে লুকিয়ে রাখা ছবি দিয়ে। কিনব না ডেনিমের জিন্স। কিনব শুধু কিঞ্চিৎ আত্মসম্মান –

ঈশ্বর, আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি? তোমার সবার জন্য উন্মুক্ত ব্যাংকে আমার অ্যাকাউন্ট নাই কেন? অন্যরা হেঁটে যায় টাকা বিছানো পথে, জ্যাকেটের ভাঁজে সেলাই করা থাকে টাকার বান্ডিল। আমার পকেটে ডানা ঝাপটায় মরুভূমির অনশন করা চিল। করতলে ফসকে গেছে কিছু প্রবঞ্চনা সওয়া বালু...

ঈশ্বর, আমি ঐ লোকটার দলে – যে নিজের রক্ত বেচে কেনে রক্তের চেয়েও গাঢ় লাল পাপড়ির গোলাপ। আমি বারান্দায় ডিম পাড়া চড়ুই পাখিটার দলে – যাকে খরচের কথা ভেবে করতে হয় না জন্ম নিয়ন্ত্রণ। তোমার মুদ্রাস্ফীতির জোয়ারে ভাসা প্রমোদতরীতে বসে প্রাণপণে শুধু করে যাই স্বপ্ন নিয়ন্ত্রণ।

যখন জয় করা যুদ্ধটাতেও কেউ হেরে যায় – চোখের দেয়ালে আছড়ে পড়ে কখনো কাঁদতে না জানা সমুদ্রের ঢেউ। তোমার চোখ শুকাতে শুকাতে শুকনো কাঠের মতো হয়ে উঠছে আগুনের আপন কেউ। তখন না জেতা যুদ্ধটাতেই লেখাই আমি নাম। সাঁতার না জানা ডুবুরি হয়ে জলেই নামলাম...

ঈশ্বর, আমিও জানি টাকা নেহাত এক কাগজের ক্রোড়পত্র। বিয়ে বা চাকরির মতোই এক চুক্তি। চাহিবা মাত্র যার বাহক পাবে মুক্তি। সেই টাকার কাগজ তৈরি হয় যে গাছ দিয়ে তার মগডালে ঝুলে আছে এক টাকশাল শ্রমিকের লাশ। ঝুলে আছে যেন যীশুর ক্রুশে আলতো হাত বোলানো ক্ষমাহীন বাতাস।

ঈশ্বর! আমার কিছু টাকা দরকার। আমার কিছু আশা দরকার। ঈশ্বর, আমার একটু ভালোবাসা দরকার। তুমি একজন অ্যাঞ্জেলকে পাঠাও। সে এসে এসব কিছু দিয়ে আর একটা গান শুনিয়ে যাক।

পোড়ো সৈকতে চোখ লাল করে তাকিয়ে আছে টাকার লাইট হাউজ। ঘুমন্ত মানুষের দল হেঁটে হেঁটে তার চারপাশে ঘুরছে, যেমন সূর্যের চারপাশে ঘোরে এ পৃথিবী। পৃথিবীর নিয়ম ছেড়ে আমি নিজের নিয়মকেই জীবন বলেছি। তাই গুহার অন্ধকারে একা মোমের আলো জ্বেলেছি। মোমও গলে যায়, গলে যায় আমার সময়। ঈশ্বর, তুমি কোনো অ্যাঞ্জেলকেই আর পাঠাও না। তোমার হয়ে টাকা পাঠায় আমার দেহ পসারিণী মা। কেননা, সে-ই আমার পরাবাস্তব হৃদয়ের নভোযানে একমাত্র বাস্তব ঈশ্বর।

## রোবট কোকিলের গান

পৃথিবীর যে প্রান্তে জ্বলছে প্রতিবাদের আগুন
এই রাতে চুপি চুপি চলো
সেখানে আমরা উড়ে যাই
ইতিহাস বই পুড়ে গেছে
চশমার ঘোলা কাচ মুছে চলো
জীবন দিয়ে বানাই ইতিহাস...
ছাই হয়ে উড়ছে জ্ঞানের ঝাঁঝালো বাতাস
অনেক সয়ে সয়ে আমরা গান করেছি
পৃথিবীর অবসন্ন রাতে –
সন্ধ্যার পাখিরা দিয়েছে সঙ্গ
আর কিছু ঘরছাড়া কুকুর
তবু শান্তি আসেনি –
বিলাসবহুল সামগ্রী দিয়েছে তৃপ্তি
প্রেম এসে পাশে শুয়ে চলে গেছে কাজে
শ্রমিকের বদান্যতা ছুঁয়ে দেখেনি প্রেমিক...
এই বৈশাখে রাধাচূড়ার সাথে ফুটছে অগ্নিফুল
সব হারিয়ে সর্বহারা বকুল
মানুষের জীবন যায় বিচারহীনতায়
রোবট কোকিল তবু বিলুপ্ত বসন্তের গান গায়...

## নদীর জন্য

আমি একটা নদীর জন্য কাঁদি। কিন্তু নদী নিজেই তো কান্না। একবিন্দু পানিকে ভাঙলে যেমন হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন পাওয়া যায়, নদীকে ভাঙলেও তেমন পাওয়া যায় কিছু সঙ্গীত, কিছু রহস্য, কিছু মুগ্ধতা আর কান্না।

নদীর সঙ্গে মাঝি, জেলে আর পাখিদের ভাব থাকে। আর ভাব থাকে গ্রাম্য বধূদের। আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের। তারা নদীতে গোসল করতে ও গরু, বাছুর গোসল করাতে ভালোবাসে। মাঝে মাঝে কাউকে কাউকে হাঙর নিয়ে যায় পা টেনে।

এখন অবশ্য নদীদের অত বাঁধভাঙা উচ্ছলতা নাই। মানুষের মানবিক দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যাওয়ার মতো, নদীগুলোও যাচ্ছে শুকিয়ে। সারা বছর উস্কোখুস্কো বুড়োর পাকা দাড়ির মতো নদীগুলো থাকে মুখ বেজার করে। একেকটা নদীর মৃত্যু সংবাদে আমি দিনে দুপুরে অন্ধকার দেখি চোখে। আমাদের চোখ যদি নদীকে পুনর্জন্ম দিতে পারত, তাহলে হাসিগুলোকে আচারের বয়ামে ভরে রেখে চোখকে বলতাম: গভীর করে কাঁদো!

## প্রেমিক যুবক

তার ছবি নারীরা ট্যাটু করে রাখে তাদের বক্ষঃস্থল ভেদ করে।
তার মুখ নিঃসৃত বাণী কিশোরীরা কোটেশন আকারে
ব্যবহার করে প্রেমপত্র লেখার সময়।
তার দর্শন অতি জ্ঞানী ও অভিজাত বলে বিবেচিত হয়
উন্মত্ত রমণীকুলের মাঝে।
তার হিউমার সেন্স দেখে সেন্স হারায় অগুনতি ভক্ত ললনা...
এবং এটাই ছিল তার জীবনের সাধনা –
এই মৌমাছি কিলবিল মৌচাকে আস্ত একটা
সুবাসিত বিশাল গোলাপ হতে পারা।
এর জন্য সে নিভৃতে বিসর্জন দিয়ে এসেছে
তার কাছাকাছি ফুটে থাকা সমস্ত বন্য গোলাপের বন্ধন,
প্রিয় নদী, পরিচিত পথ, পুরোনো আড্ডার শখ
শকুন্তলার প্রেম, এমনকি তার নিজের
শাপলা ফুলের মতো হাসি। এখন সে অতিমাত্রায় ফটোসচেতন –
আর আরো বেশি সচেতন জ্যান্ত মাংসল হৃদয় নিয়ে খেলায়।
মুখোশের রূপে মুখ তো চিরকালই আত্মপরিচয় হারায়...

## পাখপাখালির দিন

বরাদ্দ খাবার থেকে ভুখা নাঙ্গা পাখিটার দূরত্ব
হাজার হাজার কোটি আলোকবর্ষ
কিংবা তারও বেশি। পাখিরা হয়তো বাতাস খেয়ে বাঁচে –
এমনটাই ভাবছিল পাখিপালক লোকগুলো।
আর গাছ সূর্যের আলো থেকে খাবার বানাতে বানাতে
কিছু প্যাকেট পাঠিয়ে দিয়েছিল পাখিদের ঠিকানায়।
উনুনে রান্না করার মতো কিছু ছিল না –
তাই ক্ষুধাকেই তারা রান্না করে খেয়ে ফেলেছিল।

# দৃশ্য

কিছু দৃশ্যের সামনে দিয়ে চলে যেতে নেই –
বরং কিছুক্ষণ থমকে থাকতে হয়
চোরের মতো চুপি চুপি তৃষ্ণা নিবারণ
করাতে হয় ঝুলে পড়া বিবর্ণ চক্ষুর।
যেভাবে কোনো লম্পট রাজকবি লুকিয়ে লুকিয়ে
দেখত অন্তঃপুরিকাদের স্নান।
সেই দৃশ্যের কথা কেউ না জানাই ভালো –
মানুষ তো শুধু মানুষের প্রেমে পড়ে, তা না
প্রকৃতির সাথে প্রেমও অদ্ভুত উন্মাদনা।
কিছু দৃশ্যে চোখ আটকে গেলে
চোখ ফেলেই পালাতে হয় বহুদূর –
যদিবা তখন মাটিতে পা ফেললেই
আলো ছায়া বেজে ওঠে শত শত কীবোর্ড হয়ে
আর দৃশ্যের চলন্ত রূপ মুগ্ধতাকেই মুগ্ধ করে।
তবু শ্যামল শস্যমাঠ ছেড়ে কাতর গরুর
প্রস্থানের মতো নিজেকে টেনে
নিয়ে যেতে হয় সম্মুখে। কিছু দৃশ্যের দিকে
আর কখনো পিছু ফিরে তাকাতে হয় না।

## গাছ

গাছ হলে ঝড়কে খুব ভয় পেতাম। আর যদি হতাম নদী বা সমুদ্রতীরে লম্বা শাখার নারকেল কিংবা ঝাউগাছ, তাহলে তো বিপদ থাকত আরো বেশি। অবশ্য কিছু কিছু গাছ বিপদ ভালোবাসে। ঝড়ে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তারা ঝড়কে বারবার নিমন্ত্রণ করে তাদের কাছে আসতে। যেমন কিছু মানুষও ধ্বংস জিনিসটার প্রতি আসক্ত থাকে। বাকি সবাই যখন গাড়লের মতো গেয়ে চলে মিথ্যে গড়ার গান, তখন কিছু মানুষ হাসে আর সম্মিলিতের আদালতে ফাঁসে। সম্মিলিত তাদেরকে একঘরে করে দেয় উন্মাদ, পারভার্ট – এইসব আখ্যা দিয়ে। কিছু পাখিও জানি হয় সাহসী। ঝড়ে তাদের সদ্য ফোটা ছানা নিহত হতে পারে জেনেও তারা ভালোবাসে বুনো বাতাসের ঝাপটায় দোল খেতে আর ছানাগুলোও অল্প বয়সে শিখে ফেলে আত্মরক্ষার রীতি। কিছু মাঝি চিরকালই ঢেউপ্রিয় হয়। পেটে ভাত নাই তাতে কষ্ট নাই কিন্তু পারাপারের নদী নিস্তরঙ্গ হলে নিস্তেজ হয়ে পড়ে তাদের হৃদয়। আমিও ঐ গাছগুলোর মতো যারা রোদ উঠলে স্বাভাবিক মুখে অফিসে যায়, অফিসের জন্য জীবন দেয় কিন্তু আসলে মনে মনে অপেক্ষা করে উদ্দাম ঝড়ের... কেননা সেদিন এক তাল নিরেট মাটিও ঘূর্ণিপাক খেতে খেতে আকাশে উঠে হঠাৎ পাখি হয়ে উড়ে যায়...

# কারণ আমরা একটা জঙ্গলে থাকি

কারণ আমরা একটা জঙ্গলে থাকি –
প্রতিদিন কোথাও না কোথাও রক্তপাতের ঘটনা ঘটে
কাউকে না কাউকে যেতে হয় মহারাজের পেটে
রক্তদৃশ্য দেখে আমরা ভুলে যাওয়ার জন্য
জোরে জোরে হাঁটি। কান্না পেলে আমরা
হাসি তামশা করি। কারণ আমরা একটা জঙ্গলে থাকি।
মহারাজের মহাভোজে খাদ্য হওয়া ছাড়াও
আমরা নিজেরাই নিজেদের খাদ্য হয়ে যাই।
কে যে আসে পিছন থেকে কুঠার হাতে টের নাহি পাই।
তাই সজাগ থাকি, রাতে ঘুম হয় না – ঘুমের ওষুধ খাই
কারা যেন ফানুস ওড়ায়, জোনাকি হারায় ছায়াপথে
মগজে প্রেম, বাইরে ভণিতা – ধৈর্য ধরে সকল সয়ে যাই
কারণ আমরা একটা জঙ্গলে থাকি। গুহার ভিতর
ভালোবাসাবাসি, জীবনের ঝুঁকি জীবনেরই হাতে
গাছের উপর বাসা বেঁধে বাতাসে দোল খাই –
আকাশে যত তারা ফোটে রোজ, তারও চেয়ে
বেশি গল্প জমে ওঠে আমাদের পকেটে।
কারণ আমরা একটা জঙ্গলে থাকি...

## নিঃসঙ্গতা আমার অটিস্টিক সন্তান

নিঃসঙ্গতা যেন আমারই একমাত্র অটিস্টিক সন্তান, যাকে দূরে ঠেলতে পারি না আবার কাছে আগলে রেখে কষ্ট পাই। যে মুহূর্তে মুহূর্তে আমাকে হাসায়, কাঁদায়, জীবন শেখায় আবার এত শিখতে শিখতে মাঝে মাঝে ক্লান্ত, বিষণ্ন হয়ে যাই।

নাড়ির বাঁধনে বাঁধা এক অবুঝ শিশু, যে সবুজ পাখিদের সাথে কথা বলে – আকাশ হয়ে বাঁচে রক্তমাংসের ছদ্মনামে। তার জন্য প্রেমিকের দরজায় খিল আঁটি। একে একে তারা ফিরে যায় আর আমি আমার নিঃসঙ্গতার গালে চুমু খেয়ে কাঁদি।

একটা প্রতিবন্ধী শিশু, চার হাতে পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে আমাকে সে খোঁজে পৃথিবীর সমস্ত কোণে কোণে। আর আমি চুপচাপ দেখি, তার ক্ষত বিক্ষত হাঁটু বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে অজস্র লাল গোলাপ ফুটে ফুটে জড়ো হচ্ছে আমার কফিনের চারপাশে।

## আমি একটা সাধারণ রোবট হতে চেয়েছিলাম

স্তন্যপায়ী প্রজাতির হয়েও আমি চিরকাল চেয়েছি একটা সাধারণ রোবট হতে। মায়ের স্তন পান করতে করতে আমি স্বপ্ন দেখতাম একদিন রোবট হওয়ার, যাতে হৃদয়কে সব দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচানো যায়। ঈশ্বরের লন্ডভন্ড ফুলবাগানে যেসব সৌন্দর্যলিপ্সু পোকা হারিয়ে যায় পথ না চিনে, তাদের একজন আমাকে গোপনে বলেছিল, সাবধানে থেকো। কিন্তু যৌবনের অন্ধ গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে আমি গ্রাহ্য করিনি তার কথা। অন্ধকার আকাশে আকাশি রঙের তারারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আলো জ্বালার চেষ্টা করছিল প্রাণপণে, শহরে আগন্তুক চিত্রল হরিণের গাইড হিসাবে। জোনাকিরা ঢেউয়ের মতো নেচে চলছিল সামনে সামনে। তবু পৃথিবীভর্তি ফুল নিয়ে জাহাজ ডুবে গেল নরকের কালো পানির সাগরে। তীরের বালুতে আটকা পড়া অক্টোপাস আর জেলিফিশের পিঠে সেইসব আকাশি রঙের তারাই মুচকি হেসে ঝিলিক মারে। যাকে তুমি বেদনা নামে ডাকো সে আসলে এক বহুবর্ষজীবী ডাক্তার, পরামর্শ দেয় অসুস্থতার। আর বাতাসের পৃষ্ঠায় সেই গানটার সুর লেখা, যা গাইলে যখনই প্রয়োজন তখনই পুনর্জন্ম হয় তোমার। এই শিক্ষাগুলো এড়িয়ে সরাসরি রোবট হতে চেয়েছিলে। কিন্তু না, জীবন চায় না তুমি মূর্খ থাকো। সবটুকু না শিখে ফাঁকি দিয়ে উপরের ক্লাসে প্রজাপতির মতো উড়ে গিয়ে জুড়ে বসো।

## অভিমানপুর

আমরা বাস করি প্রাচীন গুহার আঁধারে –
বাইরে অনেক আলো, বাইরে প্রগতির সিঁড়ি
চলে গেছে স্বর্গের ছাদ পর্যন্ত। আমরা বাস করি
অনেক ব্যস্ততা হৈ-হট্টগোলের মাঝে। ভিতরে গুহায়
এক অলস রাক্ষুসে অজগর পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে।
আমাদের মুখে মাখনের মতো শুভ্র হাসি
আমাদের হৃদয় চিপড়ালে ঝরবে গ্যালন গ্যালন
তরতাজা কান্না। আমাদের ঈশ্বর অহংবোধে উন্নাসিক
এক উন্নত বিশ্বের নাগরিক, খেলার ঘরে খেলনা
ছুড়ে মারার মতো সে আমাদের দিকে ছুড়ে মারে
রাশি রাশি বোমা আর আমরা সেগুলো কুড়োতে গিয়ে
উড়ে যেতে যেতে বলি: কী মজা! কী মজা!!
আমাদের প্রেমের শিখা নিভে গেছে প্রচুর বৃষ্টিপাতে
তবু আকাশে কাঠকুটো যোগাড় করে ফায়ারপ্লেস বানায় চাঁদ
গরীবগুর্বোগুলো আর পোষ না মানা পাখিগুলো
যেন শীতে না মরে যায়। চাঁদ আর কুয়াশার বাসরে
গান গায় নতুন আমের মুকুল। আমরা সেই গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে
অন্ধের ছড়ি হাতে ঈশ্বরের শহর ছেড়ে চলে যাই অভিমানপুর।

## পলায়নবাদী

এই যেমন তোমার কথার মাঝখানে আমি হঠাৎ করে থামিয়ে দিই, বলি: থাক, এই প্রসঙ্গটা এখন চেঞ্জ করি? কিংবা যা শুনতে চাই না, সেই ঘোষণা বারবার বাজতে থাকলে কান চেপে ধরি। হৃদয়বিদারক হবে ভেবে অনেক কিছুই শেয়ার দিই না। অনেক কিছু সভয়ে এড়িয়ে চলি। কে যেন বলেছিল, অন্ধ হলেই বন্ধ থাকে না প্রলয়। তবু সাময়িক সুবিধার খাতিরে আমি অন্ধত্বকেই আঁকড়ে ধরি। যেন ভূতের গল্পের বই হাতে এক শিশু প্রাণপণে একটার পর একটা পৃষ্ঠা উল্টিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ভিতরের লেখা পড়তে সাহস করছে না।

আমাকে তুমি বলতে পারো স্বার্থপর কিংবা কাপুরুষ। মেয়েরা তো আবার কাপুরুষ হয় না। হতে পারে ভীতু নারী। যে বালিকা পুতুল মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাইবাড়ি পাঠিয়ে সত্যি সত্যি কাঁদত, এখন সত্যি মানুষের বিদায়ে সে কী বা করবে!

দাবানলের আলোয় বসে বসে বরং একটা প্রেমের কবিতা পড়ি।

কামুর 'আউটসাইডার'-এর নায়কও তো পালিয়েছিল ঘটনা থেকে কিংবা সে এতটাই অবহেলা করেছিল যে ঘটনাটা ঠিক কবে ঘটেছিল সেটাই মনে করতে পারছিল না। বিচারকমণ্ডলী আর সুধী সমাজ ছি ছি করেছিল, নিষ্ঠুর বলে ঘৃণা করেছিল। আর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সে শূন্যে পাক খেতে দেখছিল ভুবন চিল, সামাজিক অভিনয় করেনি বলে কেউ তো পাখিগুলোকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়নি কোনোদিন!

# ছোট্ট নীল পুচ্ছের মাছ

আমি বেঁচে আছি কিছু ভালো মানুষের সময়ে। তাই যা কিছু খারাপ সংবাদ সেগুলো মনে হয় রূপকথা। সেগুলো যেন অন্য কোনো দুয়োরানীর দীর্ঘশ্বাস, অন্য কোনো কোটালপুত্রের লেখা কবিতা।

ভালো মানুষগুলো আমার চারপাশে সতেজ বৃক্ষের মতো জঙ্গল হয়ে ছেয়ে আছে। তারা আমাকে আড়ালে রাখছে দাবানলের উত্তাপ থেকে। সারা রাত ছাদে শুয়ে থাকলে তাহারা আকাশের তারা হয়ে কপালে ঝরায় এক ফোঁটা ভালোবাসার শিশির।

তারা যেন আয়না। আমার অপ্রকাশিত ব্যথাগুলো তারা তাদের স্বচ্ছতা দিয়ে ধরে ফেলে। আর শিয়রে বসে থাকে শুভ্র-হৃদয় সেবিকার মতো। অবিশ্বাসের অসুখ যতই ঢুকতে চায় আমার কেবিনে, তারা তৎপর হয়ে একযোগে সে অসুখ তাড়িয়ে ছাড়ে।

কিন্তু আমি বেঁচে আছি কিছু খারাপ মানুষের সময়েও। যারা মানুষের মনে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায়। মানুষের হৃদয় যাদের প্রিয় খাদ্য আর ধোঁকাবাজি পছন্দের পানীয়। তারা গভীর পানির নিচে থেকে ঐ আকাশে পাখিদের পান্থশালা পর্যন্ত ছড়িয়ে রেখেছে বিষ। পাথর ঘষে যে আগুন তুমি আবিষ্কার করেছিলে জীবন বাঁচাতে, পান থেকে চুন খসলেই তারা সেই আগুন লেলিয়ে দেয় জীবনকে ধ্বংস করতে।

আমি এমনই এক বৈপরীত্যের সময়ে বাস করি। ভালো আর মন্দগুলো একজন আরেকজনকে ঢেকে ফেলছে, কখনো মেঘ ঢেকে ফেলছে সূর্যকে, কখনো সূর্য হটিয়ে দিচ্ছে মেঘগুলোকে। আর আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি দাঁতাল কুমিরের সাথে তোলপাড় লড়ে যায় একটা ছোট্ট নীল পুচ্ছের মাছ।

## ডানাকাটা পাখির ওড়ার স্পৃহা

এইসব রোদ টর্চ জ্বেলে জ্বেলে নিয়ে যায় অন্য পথে, যে পথে কখনো যাইনি। এই রোদের গন্ধটা নতুন। কুকুরের মতো আমি গন্ধ শুঁকে এগিয়ে যাই পিছে পিছে। রোদ নিয়ে যায় সমুদ্রের ঠিকানায়। দূর থেকেই আমি তার গন্ধ পেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠি। কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করি। এই ঘেউ ঘেউ চোর ধরার জন্য না, প্রিয় কাউকে পাওয়ার জন্য।

আসমুদ্র নীল আঁচল বিছিয়ে শুয়ে আছে সমুদ্র, যেন লাজুকলতা বসে আছে বাসরে। আর নীল আকাশ হলো তার বর। তাদের শুভদৃষ্টি চলাকালীন সময়ে কোনো সংকেত না দিয়েই আমি এসে পড়ি কাছাকাছি।

নীল আকাশ থেকেও আমি এক ধরনের গন্ধ পাই। এই প্রথম আকাশের গন্ধ পেলাম। এর আগে পেয়েছিল সুকুমার রায়ের গন্ধবুড়ো।

কাঁকড়ারা পায়ে পায়ে বালু কেটে চলে যাচ্ছে আর আসছে। তাদের অনেক ব্যস্ততা। কাজ করতে হবে, বাজার করতে হবে, রানতে হবে, কাপড় ধুতে হবে, বাচ্চা মানুষ করতে হবে।

কিন্তু আমার অত ব্যস্ততা নাই। আমি এক সাধারণ কুকুর। সব হারিয়ে আবার ফিরে পেয়েছি সবকিছু। আসলে হারায় না কিছুই, শুধু চোখের আড়াল হয় এই যা।

শিশুরা ঝিনুক কুড়াচ্ছে। কেউ কেউ ঘুড়ি ওড়াচ্ছে বীচের ঐ দিকটাতে। হাওয়া এসে ওড়াল বালু। সমুদ্র ছলাত ছলাত। সবখানে কী যেন একটা ফুর্তি, তাই আমি ঠিক করেছি বাকি জীবন সভ্যতা থেকে পালিয়ে গা ঢাকা দেব প্রকৃতি আর শিশুদের মাঝে। একটা দশ টাকার বেলুন যে আনন্দ এনে দিতে পারে, সেই আনন্দের লেশমাত্রও দিতে পারেনি ডায়মন্ডের নেকলেস।

পিঠ পেতে আছি রোদ্দুরে, যাতে ক্ষতগুলো তাড়াতাড়ি শুকায়। আর হৃদয়ের ক্ষত শুকাতে দেব না, কাউকে দেখাব না। কারণ, লক্ষ করেছি ডানাকাটা পাখিটার অন্য পাখিদের তুলনায় ওড়ার স্পৃহা বেশি!

# জোছনার পিদিম জ্বলা দিগন্তে

জোছনার পিদিম জ্বলা দিগন্তে নির্জন পৃথিবী। তবু এই নির্জনতায় কেউ যেন কাউকে খোঁজে, বাতাসের কোট পরা অদৃশ্যমানতাকে জনে জনে জিজ্ঞেস করে। সবুজ লাউয়ের লতায় পেঁচানো কুঁড়েঘর হয়ে যায় নির্বাসিত এক গভীর দ্বীপ। আগত শীতের হিম আঙুল ঘাড়ের দুই পাশ থেকে জড়িয়ে ধরে। যেন ভয় নেই কোনো, নেই আহত হওয়ার সতর্কতা, কোথাও কোনো তিক্ততার আঁচড় ছাল ছিঁড়ে চিহ্ন রেখে যায় নাই – শুধু ভালোবাসা আছে ঘাসে ঘাসে শিশির হয়ে, চাঁদের অপূর্ব দৃষ্টি হয়ে। এই বোধ নিয়ে জোনাকি উড়ে যায়, লক্ষ লক্ষ বরই ফুল হাসে পাতার ফাঁকে ফাঁকে, দূরে কোনো অচেনা পাখি ডেকে ওঠে অচেনা মানুষের গাঁয়ে। কুয়াশার সাদা পর্দার ভিতরে বাঁশি বাজিয়ে বসন্ত নড়েচড়ে ওঠে।

টিনের চালায় আয়না পেতে চাঁদ তার মুখ দেখে সারারাত আর তুমি ঘরের ভিতর গরমে হাঁসফাঁস। তোমার মাথার নিচে টলটলে একটা শিশিরের বালিশ যদি রেখে আসতে পারতাম, জানতে তখনই তুমি আমার নাম। যেভাবে সমুদ্রের পাশে শুয়ে শুয়ে ঝিনুক গায় সমুদ্রের গান। পৃথিবী এই ভালোবাসার ঠিকানা না পেয়ে অন্ধের ছড়ি হাতে কড়া নাড়ে যুদ্ধের দরজায় অথচ ছোট্ট গুবরে পোকাও উতরে যায় প্রেম আর শান্তির পরীক্ষায়। আর তাই দেখে শান্তি পাই আমি, জানি এ অস্থির চাওয়া পাওয়ার জিভে ভরা বিকট চেহারা চাইলেই কপাট বন্ধ করে চলে যাওয়া যায় অন্য কোনো সুনীল উপত্যকায়।

## লোকটার জন্য এলিজি

লোকটা পুড়ে ছাই আর সেই ছাই বাতাসে উড়তে উড়তে অনেক উপরে উঠে ডেকে আনে পূর্ণিমার চাঁদকে। আর বলে, তোমার টর্চ জ্বেলে দেখো আমাদের হৃদয়ের সব ফুলগাছ ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে ছাইগাছের চাষ করবে বলে। চোখে ছাই দিয়ে সব রং কেড়ে নিয়ে বিক্রি করে দেবে অন্ধের হাটে। কালো ছড়ি হাতে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাবে সময়, রেল লাইনে কাটা পড়বে তার মাথা। আর সেই মাথা নিজের ঘাড়ে লাগিয়ে একটা ফড়িং উড়ে যাবে সেই অন্ধদের জন সমাগমে। যারা সময়ের এই মৃত্যুদৃশ্যের ছবি তুলছিল, ভিডিও করছিল এক্সপার্টের মতো অন্ধ চোখ দিয়েই। তারপর আকাশের চাঁদ গোল হয়ে এলে প্রেমিক কোথাও আর ফুলের মালা না পেয়ে তার প্রেমিকার গলায় পরিয়েছিল ছাইয়ের মালা আর নিজের গলায় সে পরে নিয়েছিল জীবনানন্দের বোধের সংক্রামক ফাঁস। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে লোকটা অমানুষদের ঘৃণার চিতায় পুড়তে পুড়তে চাঁদকে বলেছিল: পরের জন্মে আর আগুন চাই না, একমুঠো বরফ করে জন্ম দিও মানুষের সীমানার বাইরে ঐ নির্জন হিমালয়ের চূড়ায়।

## খরগোশ ছানার পৃথিবী দর্শন

চাঁদরাতে ঘর পালাল খরগোশ ছানা। সেও নাকি সিদ্ধার্থ হবে।
কিন্তু লোকে বলে আজকাল নাকি কেউ আর সিদ্ধার্থ হয় না।
বড়জোর ধর্ষিত হতে পারে পার্কে, নির্জন ট্রেন স্টেশনে,
বিক্রি হয়ে যেতে পারে দেশে কিংবা বিদেশের কোনো ব্রোথেলে
অথবা আদম ব্যবসায়ীর হাতে পাচার হয়ে
চলে যেতে পারে মধ্যপ্রাচ্যে। তারপরও ঘর পালাল
খরগোশ ছানা। অ্যাঞ্জেল তারকারা ধরে ছিল হাতের মুঠি –
গাছেরা শিকড় পেঁচিয়ে তার হাতে হয়েছিল আংটি
পৃথিবীটা যতটা বস্তুতান্ত্রিক তার চেয়ে বেশি হৃদয়তান্ত্রিক
ঘুরে ফিরে এটাই বুঝে গেল সে।
সমুদ্রের উত্তাল উপকূলে শুরু থেকে শেষ প্রান্তে
অগুনতি মানুষ হৃৎপিণ্ড চেপে কাতরাচ্ছে
ক্ষত বিক্ষত হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত গড়িয়ে গিয়ে
পাশের সমুদ্রের নীল পানিকে করেছে লাল।
ওদেরকে লাফিয়ে ডিঙিয়ে যেতে যেতে সে
হাতে ধরে রাখে হৃৎপিণ্ড শেপের একটা লাল বেলুন।
যার আঘাত করার বা আহত হওয়ার আর ঝুঁকি নেই।
এছাড়া এ পথে ছিল ঈশ্বরের নরকের বাগানে জ্বালানো
অগ্নিকুণ্ড। পথের পাশে ঝোপঝাড়ের আড়ালে
একই রঙের ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকা ডাইনোসর।
আর জীবিকার যুদ্ধনৌকায় মাস্তুল তুলে দেওয়া
বুদ্ধিজীবী শিয়াল, যাদের চোখ থেকে আগুন বের হয়।
জীবন জীবিকার জুয়ার টেবিলে তারা
অধীনস্থদের হারিয়ে হাতে পরাত শিকল।
আর ছিল কপট প্রেমিকের দল, ফুলের মালা দেখিয়ে
চোখ বন্ধ করতে বলে তারা গলায় পরাত ফাঁস।
এসব দেখে শুনে পা পিছলে গিয়ে, আগুনে হাত পুড়ে
নদীর স্রোতের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে
পাখিদের পিঠে চেপে উড়তে উড়তে
ফিরে সে এসেছিল নিজের ঘরে। তার খরগোশ মা
তাকে দেখে অবাক হতেই বলেছিল: এই তো একটু ছবি আঁকতে
গিয়েছিলাম মাঠে। আর এক রুম থেকে অন্য রুমে যেতে ভয় পায়
এমন ভীতু নিজেকে বলেছিল: আসলে কোথাও যাইনি আমি
সবটা ছিল একটা দীর্ঘ স্বপ্ন। এখন আরেকটু ঘুমাই...

## ধর্ষণ

বৃষ্টির সাদা রশি আত্মহত্যার ফাঁসের মতো
জাপটে ধরেছিল মেয়েটার গলা
আর মেয়েটা ঘুরপাক খেতে খেতে অনেক মেঘের স্তর ভেঙে
পড়ে যাচ্ছিল নিচে...
মেয়েটা ঘোর কিংবা স্বপ্নে টের পাচ্ছিল
তার আঙুল কামড়ে নিচ্ছে পিরানহা...
নিচে সবুজ বনের ভিতর দাঁড়িয়ে ছিল কিছু লোক
আকাশে বড়শি পেতে।
তাদের চোখ গাঢ় লাল, তাদের ঠোঁটের চারপাশে
বিগত শিকারের গন্ধ, তাদের হাতে নীল পশম।
মেয়েটা ঘোর কিংবা স্বপ্নে টের পাচ্ছিল
তার আঙুল কামড়ে নিচ্ছে পিরানহা...
একটা ছাতিম গাছের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে ত্রস্ত টিয়া
একঝাঁক কাক তার পিছু নিয়েছে আর
চিৎকার করছে। সিগারেটের আগুন খসে পড়তেই
পুড়ে যায় এক কাপ জ্বলজ্যান্ত চা –
মেয়েটা ঘোর কিংবা স্বপ্নে টের পাচ্ছিল
তার আঙুল কামড়ে নিচ্ছে পিরানহা...
তলপেটে ব্যথা আর বমি আর রক্ত, অনেক রক্ত
বুঝি একটা ঝর্না বানানো যাবে এই রক্ত দিয়ে।
এত রক্ত সে উঁকি দিয়ে দেখেছিল তার ছোট ভাইয়ের
জন্মের সময়। কিন্তু সে তো কাউকে প্রসব করছে না।
মেয়েটা ঘোর কিংবা স্বপ্নে টের পাচ্ছিল
তার আঙুল কামড়ে নিচ্ছে পিরানহা...
তখন ঝুমবৃষ্টি অসংখ্য, অগুনতি –
বৃষ্টির সাদা রশি পেঁচিয়ে নেমে আসছে আত্মহত্যার ফাঁসের মতো
অথবা কিছু অবোধ প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো।
নারী শরীর না পেয়ে বাতাসের শরীর পাওয়াই ছিল ভালো।
মেয়েটা ঘোর কিংবা স্বপ্নে টের পাচ্ছিল
তার আঙুল কামড়ে নিচ্ছে পিরানহা...

## ইচ্ছা করে চিপায় চাপায় ঢুকে একটু কাঁদি

ইচ্ছা করে শুধু চিপায় চাপায় ঢুকে একটু কাঁদি –
লোকজনের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চক্ষুর অগোচরে
অসংখ্য প্রশ্নবোধকের ক্যাটক্যাটে কৌতূহলের দিকে
ডাস্টার ছুড়ে দিয়ে – ইচ্ছা করে অনেকক্ষণ ধরে
শান্তিতে কাঁদি। কান্না কখনো কখনো ক্ষুধার সমানুপাতিক
হতে পারে আর কাঁদার অধিকার পেতে বিপ্লব হয়ে যেতে পারে
পৃথিবীর আগুন ধরা গোলকে। কাঁদতে পারাই যখন এত
সুখকর হয়ে ওঠে কারো কাছে, তখন কান্না আর দুঃখ-বেদনার
কোনো বিষয় থাকে না, বরং তা হয় আনন্দের স্মারক।
আমি তো দেখেছি প্রচণ্ড মন খারাপ নিয়েও মানুষ
হাসি হাসি মুখ করে ছবি তোলে, যদিও চোয়াল গড়িয়ে
লালার মতো ঝুলে থাকে বিমর্ষতা। গান গাওয়া পাখি ডাকলে
জন্মান্ধ মেয়েটা তাকে বসন্তের আভাস বলে জানলেও
পাখি হয়তো করছে তখন বিচ্ছেদের বিবর্ণ চিৎকার।
সাগরতীরে উড়ুক্কু বাতাস পর্যটকের মন ভোলালেও
এই বাতাসে কত কত জেলের ফিরে না আসার সংবাদও তো
মিশে থাকে। তাই হাসি বললেই আজকাল আর আমি আনন্দ
কিংবা কান্না বললে বিষাদকে বুঝি না।
অনুভূতির নাম কখনো পুরোটা অনুভূতি ধারণ করতে পারে না –
যেমন মানুষের নাম সেই মানুষটার অজস্র চিন্তা, স্বপ্ন,
সংবেদনশীলতাকে ধারণ করে না। ইচ্ছা করে
চিপায় চাপায় ঢুকে একটু কাঁদি – যাতে কেউ দেখতে না পারে
যাতে কেউ প্রশ্ন করতে না পারে। ভালো হয় মায়ের গর্ভের আচ্ছাদনে
ফিরে গিয়ে কিছুক্ষণ অঝোরে কাঁদতে পারলে।

## বুনো সমুদ্র

পৃথিবীর সব শব্দ থেমে গেলে মাছির গুঞ্জনের মতো
মৃদু স্বরে শুরু হয় ঝড় –
রাত যত বাড়ে তত বাড়ে সেই ঝড়ের উদ্দামতা
বিকট গর্জন! সমুদ্রে ঝড়!!
তীরে কিছু গাছ ভেঙে পড়ে ঢেউয়ের থাবায়
দূরের কোনো সামুদ্রিক ঠিকানায় না, ঝড় বয়ে যায়
আমারই শরীরে রক্তের অতলতায় –
যে সমুদ্রের পানি ভয়ানক টকটকে লাল
কিন্তু সে লাল রং মনে ছড়ায় না কোনো নৃশংসতার জাল।

এই পূর্ণিমায় শত শত কাজের অমাবস্যাকে ছুটি দিয়ে
চলো যাই সমুদ্রস্নানে –
সেই কথা বলব যা বলিনি জীবনে।
মরুভূমিতে আরো বেশি করে পুড়ুক এই বৃষ্টিহীন শহর
কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি শুধু জমে থাকুক মানুষের
কখনো না কাঁদা চোখের কোটরে।
এই পূর্ণিমায় চলো যাই সমুদ্রস্নানে –
সেই কথা বলব যা বলিনি জীবনে।

শঙ্খের কানে কানে সমুদ্র শোনাবে প্রিয় গান
জোয়ার ডেকে নেবে ক্ষীণকটি ঝিনুক সুন্দরীদের
গাংচিলের চিৎকার কান থেকে মুছে দেবে
নাগরিক শব্দ দূষণের সম্ভার –
বিকালের শেষ ঢেউয়ের আছাড়ে ফিরে আসবে
নিরুদ্দেশ জেলে গলুই ভরা মাছ আর হাসি নিয়ে।
এ রাষ্ট্র জলের, এখানে রাষ্ট্রপতির নাম বুনো সমুদ্র –
এই পূর্ণিমায় চলো যাই সমুদ্রস্নানে –
সেই সব করে দেখি যা করিনি জীবনে।

লাইট হাউজ! তোমার একচোখা পথ নির্দেশনা থামাও
আমি আকাশ ভর্তি তারাদেরকে বলি পথ দেখাতে।
সভ্যতার কাছে পোষ মানতে মানতে মৃত হৃদয়
সমুদ্রের বন্য হাওয়ায় যদি আরেকবার পুনর্জন্ম নেয়
তাহলে আর কখনো ফিরব না তোমাদের
প্লাস্টিক ফুলের অরণ্যে ভিখারি প্রজাপতি হয়ে।

## নীরব শ্রমের ব্যাংক

এই গুহায় আমি থাকি বহুকাল। দেয়ালে জন্মানো
ফাঙ্গাসগুলো সূর্যের মুখ দেখেনি কোনোদিন
তবু তারা উৎপন্ন করে ক্লোরোফিল
নিজের মনগড়া সূর্যালোক খেয়ে হয় জ্বলজ্যান্ত নীল।

টেবিলে ফ্রেম করা পূর্বপুরুষের ছবি – জানি তাদের শৌর্য-বীর্য
ছিল অনেকখানি। হাতের ছড়ি ঘোরালে উঠবস করত দিনরাত
এই ঘরে রাত শুয়ে থাকে বারোমাস
আমি অন্ধ, নাকি অন্ধকার আমার চারপাশ?

দুইটা টিকটিকি প্রায়ই সঙ্গম করে সিলিং ফ্যানের পাখায়
ভাবি এ অযাচিত নীলছবির দর্শক কেন আমাকেই হতে হয়!
ফাল্গুন জানেনি পৃথিবীতে ফুলের কারসাজি
প্রেমহীনতায় যাদের জন্ম, তারা বুঝি অভিশপ্ত এমনই
উষ্ণ হৃদয় নিয়ে বেঁচে থাকে এক শীতল রক্তবিশিষ্ট প্রাণী।

আমার গুহার মতো এমন অসংখ্য অশেষ গুহা
যেন সময়ের শৌখিন ত্বকে বিশ্রী কিছু ক্ষত।
সেই ক্ষতের মধ্যে অনুভূতিময় পোকাদের স্বপ্নিল অস্তিত্ব।
শ্রমগুলো বোবা, তারা শিখে গেছে শ্রমিকের নীরবতা –
ঘরে কোনো আসবাব নেই, কারণ এ ঘরে থাকে অদৃশ্য শ্রমেরা।

মাসের মাঝামাঝি, পকেটে নাই দুই-দশটা টাকা
পাকস্থলী ভর্তি শুধু পুষ্টিকর হাওয়া।
খসে পড়া তারার বালিশে মাথা রেখে ভাবি
ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমে আছে অনেক সম্পত্তি।
সেই সম্পদ হলো সেই বোবা শ্রমগুলো –
যাদেরকে কিছুতেই অর্থে রূপান্তরিত করতে পারি না।

ঝড় এলে আমি খুলে দিই সবক'টা দরজা জানালা
ভয়ংকরের সৌন্দর্য থেকে চোখ ফেরাতে পারি না –
মুমূর্ষুকে মরতে দাও, বঞ্চিতকে করো আরো বঞ্চিত
উপোসি শিশুটার হাত থেকে রুটি ঠুকরে নিক দাঁড়কাক
দেয়ালে সবার পিঠ ঠেকে যাক – ঠেকে গেলে টের পাই
বিপ্লবই আমার এতদিনের আরাধ্য সখা।

## নৈঃশব্দ্যের মুখোমুখি

মাংসাশী রাতের সোফায় জেগে বসে আছে
একা প্রেমখেকো বাঘ। জানালার বাইরে চাঁদ ডাকছে: হালুম!
সবুজ কাচের চোখ ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো –
বৃষ্টির ফোঁটা গলে যাওয়া হেরোইন।

বাঘের শয্যায় ভাঙছে আড়মোড়া
সুন্দরী মায়াহরিণ। মাংসের ঘ্রাণে
গভীর রাতে হাসে ফুল ফোটার দিন।
প্রেম ছাড়া আর কিছু খাবে না সে – এই তার জিদ।

ডোরাকাটা দেহের পাশে পাশে ওড়ে একঝাঁক সাদাকালো
প্রজাপতি। তাই দেখে সুঠাম ব্যাঘ্র সমাজ করছে ছি ছি ছি।
গাছ যেমন তাকিয়ে থাকে, আকাশের পেটে বড় হয়
মেঘের ভ্রূণ। সেও তাকায় মহাকাশে প্রেমের জন্য হবে খুন।

আরেক আছে লোভী সিংহ যুদ্ধক্ষেত্রের প্রহরী –
মুখের চেয়ে মুখোশের আকর্ষণ তার কাছে বেশি
পোড়ো লাশের হৃদয়ে নিঃসঙ্গতার বসন্ত কাঁদে
প্রতিশোধের অমানিশা ছক আঁকে মস্তিষ্কের কপাটে।

যুদ্ধখেকোর মেদ বেড়ে গিয়ে হয়েছে হাতি
বৃদ্ধ ঈশ্বর তার জন্য খাবার রেখেছে রাশি রাশি।
এই প্রেমখেকো আর যুদ্ধখেকোর পাল্লায় পড়ে
রে নৈঃশব্দ্য! তোর মুখোমুখি হওয়াই জানি রয়ে যাবে বাকি।

## মৃত্যু

নখ থেকে নেইলপলিশের
দূরত্বে অবস্থান করছে মৃত্যু।
ঘুম ঘুম চোখে মনে হয়
পায়ের কাছে ভৃত্যের মতো
বসে রয়েছে ঘাতক।
কোনো এক বেদনা সঞ্জীবনী গাছের পাতা থেকে
এক ফোঁটা জল ঝরে কপালে।
মৃত্যু! তোমার উগ্র লাল লিপস্টিকের
রঞ্জক করে নাও আমার রক্ত।

## হাত ছেড়ো না অনিরুদ্ধ

দুঃখের মৌচাকে রাশি রাশি অশ্রুর ফোঁটা লেগে আছে
মৌমাছির মতো। একটু নাড়া লাগলে বা সামান্য একটা
ঢিল পড়লেই দলেবলে আক্রমণ করবে সহিংস অশ্রুর ঝাঁক।

সমস্যার হাড়গোড় নিয়ে বসে আছে পাহাড় সমান উঁচু জাদরেল কুকুর –
তুমি যতই প্রত্যাখান করো, সে তোমাকে কিছু হাড়গোড় গছিয়ে
দেবেই দেবে। আর না নিলে সাথে সাথে ঘাড়ে বসাবে কামড়।

অনিশ্চয়তার জাহাজ কোলে নিয়ে গর্জন করছে ঝড়ো সমুদ্র –
যখন ভীষণ দরকার, তখন কম্পাসটাই অকেজো!
লাল লাল চোখ করে তাকিয়ে আছে ছায়াপথভর্তি গ্রহ নক্ষত্র।

দুশ্চিন্তার পালকগুলো রাতারাতি পাথর হয়ে চেপে আছে পরিমাপে –
পুলিশ ভ্যানে উঠতে উঠতে আসামী ভাবে, তার দোষটা কী ছিল জানা নেই
ঘুমের ঘোরে সে বিড়বিড় করে আর পিছু হেঁটে পায়চারি করে টর্চার সেলে।

অপবাদের ক্যাকটাস ভালোবেসে ঘন ঘন আলিঙ্গন করে –
স্বতন্ত্র হওয়ার অপরাধে তুলার মতো বাতাসে ওড়ে বর্শার ফলা
ভীষণ দুর্বিপাকে সাত পাক ঘুরে আসে আহত বেহালা।

এমন সুসময়ে তুমি আমার হাত ছেড়ো না অনিরুদ্ধ –
অনেক কিছুই ছেড়েছে আমাকে, যা ছাড়া জীবন অর্থশূন্য
সেই শূন্যতাই দিয়েছে তোমাকে প্রিয় উপহার আমার মৃত্যুদিনে।

আগুনকাব্য

এ আগুন আগুন না, আমার প্রতি তোমার শ্রেণিঘৃণা
সমুদ্রতলে জলের ছদ্মবেশে লুকিয়ে ছিল সে
ছিল কারখানায় দুপুরের খাবার নেয়া টিফিনবক্সে
আগুন ছিল হাসিমুখের আলিঙ্গনে
আগুন ছিল অদৃশ্য গল্পের প্রতিটা দৃশ্যে –

একা এক ঘরে একা একা জ্বলছিল মোমের শিখা
বাতাস তাকে ছড়িয়ে দিল ঘর থেকে ঘরে
সে বাতাস ছিল প্রেত হয়ে যাওয়া আমাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস
আগুনে পোড়ে ফুল, ডানায় ভাসে ছাইয়ের সংসার –

এক কণা ছাই উড়ে এসে জুড়ে বসে চোখের ভিতর
হৃদয়ের প্রজ্বলন স্তব্ধ করে চোখ জ্বলে যায় অনন্তকাল
কেঁচোর মতন বাঁচি তবু মাটি – সে নয় আমার
দেশে দেশে বৃথা যুদ্ধ, পৃথিবীটা শ্রেণিযুদ্ধের খামার –

এত আঁচ আগুনে, আগুন সে কি জানে
বসন্তে এমন ঝগড়া করতে নেই, হাত ছাড়তে নেই প্রিয়ার
আমার প্রিয়া হাতে হাত ধরে আর হাঁটবে না পাশে।
রক্তিম দাবানলে উড়ে গেছে একটা সুন্দরী ফিনিক্স পাখি –
আমি দাঁড়িয়ে দেখি, দমকল বাহিনীর
অঝোর বৃষ্টিতে সে আগুন এক ফোঁটা নেভেনি।

## মাথা তোলো ক্রীতদাস

মাথা তোলো ক্রীতদাস! ফাগুনের ঝড়ে পুষ্পিত বাতাস
যাচ্ছে বয়ে... বেরিয়ে আসো চোরাকুঠুরি ছেড়ে...
বাতাস তোমাকে জড়িয়ে ধরতে চায়।
মাথা তোলো ক্রীতদাস! আর কখনো যেন বলো না
নিঃশ্বাস নেওয়া কী যে কঠিন হৃদয় পচার গন্ধে বুঁদ এই শহরে।
পা ফেললেই খেতের আল। রোদের আঙুল ধরে আসো
আমার বাড়ি। পুকুরের মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে মাথা তুলে
স্বাগত জানাবে অতিথিকে। ঝাল করে তোমার জন্য রাঁধব
বাগানের পুঁইশাক আর গুটি বেগুন। রাত হলে ছেড়ে দেব চুল –
খোঁপার কাঁটা গুঁজব কুটোর চালায় –
মাচা থেকে ঘুম ঘুম চোখে সুখী চড়ুই
তাকাবে আমাদের দিকে। মাথা তোলো ক্রীতদাস!
তোমার যে কথা কেউ শোনে না তাই শুনব একদিন
মাটির দেয়ালে হেলান দিয়ে ঝুমবৃষ্টি নামলে।
অথবা কথারা শুনবে আমাদের তৃপ্তির গান –
মাথা তোলো ক্রীতদাস! অবহেলার পাথরে কপাল ঠুকে
রক্তাক্ত হওয়াকে আর নাম দিও না মহান।
যেখানে তুমি আছ অথচ কারো কাছে নেই তোমার অস্তিত্ব
সেই শূন্যস্থানে একটা তৃষ্ণার্ত ছুরি রেখে চলো পালাই
যে নিকষ অন্ধকারে দুজনে দুজনকে দেখতে পাই।

## শাশ্বত

হাতে হাত বদলে যায়
তবু ফাগুন বাতাসে একই সুর বাজে
ভোমরা একই সুরে গান গায়
আমি জানি না এই ভোমরাটা সেই ভোমরা কি না
গত বসন্তে যে এসেছিল আমার ঘরের জানালায়

মাঠ জুড়ে ধান বেড়ে ওঠে
যেন কৃষকের ছেলের সবুজ চুলের গুচ্ছ
এই চুলে আলতো হাত বুলাতে চাই –
জানি না এ সবুজ ধান সেই ধানগাছ কি না
ছোটবেলায় যাকে বাড়তে দেখেছি বাড়ির পাশের ভিটায়

শৈশবের বনভূমির মাথায় দেখা চাঁদ
আজও ওঠে শহরের ঘোলাটে চিলেকোঠায়
আমার সন্তানও দেখবে সেই চাঁদ –
চোখ বদলাবে কিন্তু চাঁদ রইবে
অবিকল নীলাকাশের প্রচ্ছদ হয়ে...

যে সিগারেট নিঃশেষ হলো মাত্র
সে কি আসলেই মৃত্যুমুখে পতিত হলো
সিগারেট কোম্পানি বানিয়েছে আরো অনেক অনেক
একই মান, একই আকৃতির সিগারেট
তাই নিহত সিগারেটের জন্য এইবেলা না কেঁদে বরং
চলো তার মৃত্যু উদযাপন করতে
জ্বালি আরেকটা নতুন সিগারেট।

হাতে হাত বদলে যায়
তবু ফাগুন বাতাসে একই সুর বাজে
তোমার ডাকনাম হয়তো পাল্টে যায়
কিন্তু তোমার প্রকৃত নাম হলো প্রেম,
যা রয়ে যায় শুধু ধ্রুব... শাশ্বত...

## শয়তান প্রেমিক

আমি এক কুৎসিত, বেঁটে, হোঁতকা মোটা শয়তানকে ভালোবাসি –
তাকে ভালোবেসে আমার বহু ভালোবাসায় মহাশূন্যের মতো বন্ধ্যা
হয়ে যাওয়া হৃদয়ে ফোটে বসন্তের মেঘ। পৃথিবীর সব যুদ্ধের
অর্জন করে আনা হাড্ডির সার, আস্তাকুঁড় আর নর্দমার জঞ্জাল
ভ্যান গগের ছবির মতো আমার চোখে হয়ে ওঠে ভয়াবহ রূপের ফাঁদ।

আমি এক দুর্মুখ, বিষণ্ন, হতাশ শয়তানকে ভালোবাসি –
তাকে ভালোবেসে সূর্যের আলতো ছোঁয়ায় কুয়াশার পালিয়ে যাওয়ার মতো
গলে যায় বিষাদগ্রস্ত সময়ের পেটে জমানো থলথলে মেদ।
চারপাশের ক্যাকোফোনির ভিতর তার অভিশপ্ত কথার মিষ্টি সুরে
বন থেকে ছুটে আসে চাকভাঙা মৌমাছির ঝাঁক।

আমি এক বোকাসোকা, অলস ক্লাউনকে ভালোবাসি –
সবাই যখন সকালে কিছু করার তাড়া নিয়ে ধেয়ে যায় বোমারু বিমানের মতো
আর দিনশেষে পরিশ্রম দিয়ে কিনে আনে কিছু গোপন কান্না
তখন আমি আর আমার ক্লাউন ওদের মদের বোতলে জমানো
কান্নার সমুদ্রে তুলে দিই নির্মল হাসির জোছনা মাখানো পাল।

আমি এক নিষ্ঠুর, জীবন নিয়ে হতাশ, ভাড়াটে খুনিকে ভালোবাসি –
যখন তুমি জানালা খুললেই শুনতে পাও প্রতিবেশীর আর্তনাদ
দরজার নিচ থেকে খবরের কাগজের ছদ্মবেশে ঢুকে পড়ে আত্মঘাতী মারণাস্ত্র
টিভি চালালে সুন্দরী সংবাদ পাঠিকা শোনায় ঘোর নরকের যাচ্ছেতাই দুঃসংবাদ
তখন সবকিছু বাদ দিয়ে সেই লম্পট খুনির হাত ধরে ছাতার আড়ালে
মরুভূমির আঁধারে যাই অজস্র তারার বৃষ্টিতে আশার অঙ্কুরিত হওয়া দেখতে।

আমার প্রেমিক সম্পর্কে তুমি অনেক বাজে ভাবনা ভাবতে পারো,
আমার সম্পর্কেও পোষণ করতে পারো এফবিআই টাইপ সন্দেহ।
কিন্তু উর্বর মস্তিষ্ক খাটিয়ে যারা তোমরা সভ্যতার ঊষর দেহটাকে
বাঁচিয়ে রাখার আশ্বাসে তার আয়ুকে জোড়াতালি দিয়ে যাচ্ছ
তাদের প্রতি আমিও হারিয়ে ফেলছি উৎসাহ। আমার প্রেমিকের মতো
পৃথিবীরও চাই এখন এমন একটা প্রেমিক, যে তার বিষাক্ত চুমুতে
তরতাজা দুপুরকে নিয়ে যেতে পারে মাঝরাতের চিরঘুমে।

## টাওয়ারে একটা প্যাঁচা

গভীর রাতে নির্জনতা ডেকে ওঠে সামান্য দূরের টাওয়ারে
একটা প্যাঁচার কণ্ঠে। কাকে ডাকে সে এমন করুণ কান্নার স্বরে?
তার হারানো সঙ্গীকে? নাকি দালানকোঠার আগ্রাসনে
নিহত পরিবারের স্মৃতিকে? তার মনের দেয়ালের ফ্রেমে
যে ছবিগুলো ঝোলানো তাতে দাঁত বের করে হাসছে
এই রাতের কালো পেলবতার মতোই অনেকগুলো রাত।

মানবিক এ অভয়ারণ্যে শুয়ে আমিও নির্ঘুম ঐ প্যাঁচাটার মতো –
একাকী অনুভূতি সমুদ্রের অতল থেকে উঠে আসা হিম
বাতাস হয়ে জড়িয়ে ধরে। প্রতিটা জানালায় আলো নিভে গেছে
তবু নেভে নাই মানুষের মনে মিলনের পিপাসার্ত আলো।
এখানে মেঘলা আকাশ – অন্য কোথাও কোনো নগ্ন বন্দরে
জাহাজের ছাদে শুয়ে শুয়ে অন্য কেউ আমার মতনই
জেগে থেকে ভাবছে ঘুমানোর স্বপ্নতাড়িত বিলাস।
একটা রোগাপটকা মশা শত্রুপক্ষের ছাউনি থেকে আসা
মাথাগরম সৈন্যের মতো হঠাৎ না বলে কয়ে শুরু করে আক্রমণ।
মশার কামড়ে তুমি নড়েচড়ে ওঠো কিন্তু নড়েচেড়ে ওঠে কি
আমাদের পাশে থেকেও দূরে সরে যাওয়ার ইতিহাস?
আমাদের প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের দূরে সরে যাওয়া
আত্মাগুলো গলে গলে বের হয়ে বানিয়েছে প্যাঁচাটার
ঠোঁট, ডানা, পা, পালক, চোখ – সারা দেহ।
সেই থেকে উঁচু টাওয়ারে বসে ভুতুম প্যাঁচাটা ডাকে –
ডাকে আসলে আমাদের বিচ্ছিন্নতার ছেঁড়াখোঁড়া নক্ষত্র-উল্কাপিণ্ড-গ্রহ।

বহুদূর থেকে দূরালাপনীর সাঁকো বেয়ে বেয়ে
তুমি চলে আসো আমার কপাটহীন জানালায় স্মিতহাস্যে।
শূন্যতার সেই অবাধ পথে আমিও যাই তোমার অন্তর্দেশ ভ্রমণে।
আমাদের যাওয়া আসার পথ স্ফুট হয়ে ওঠে বৃষ্টিছাড়া রংধনুতে।
রাতের জন্মান্ধ মানচিত্রে ঘুমন্ত মহাবিশ্ব দেখে
উল্টানো চাঁদের মতো লটকে আছে একটা পরিতৃপ্ত রংধনু।
দূরত্বের আবছায়া থেকে তোমার কাছে আমি আসতে পেরেছি
তাই বাকি পৃথিবীকেও ছুঁতে পারব বলে ছুটছি...
রাপ পাপা পারা রা রাপ পাপা পারা রা রাপ পাপা পারা রা
উম হুহু হুহু হু উম হুহু হুহু হু উম হুহু হুহু হু উমম...

## স্মার্ট নাগরিক

আমার এক হাত নরকের কবর খুঁড়ে তুলে আনে
কবিতার হাড়গোড়, খুলি, করোটির ফসিল।
আর অন্য হাত স্বর্গের বাগানে প্রজাপতির ডানা থেকে
রং চুরি করে এনে রঙিন করে এই
সাদাকালো পৃথিবীর বর্ণান্ধ দেয়ালের শরীর।
আরেক হাত সম্রাজ্ঞী পাকস্থলীর তুষ্টির জন্য
নিজের জীবন বাজি রেখে উদ্ধত ঈগলের মুখ থেকে
ছিনিয়ে আনে নধর, সুস্বাদু শিকার।
তারপরও নেই কোনো বিকার...
আমাকে সবাই দেখো ভালো করে –
আমি হলাম এই সময়ের সবচেয়ে স্মার্ট নাগরিক!

আমার এক হাত আকাশ ছাড়া আর কিছুই করে না স্পর্শ
কেননা স্বাধীনতা শব্দটার প্রতি সে ভীষণই স্পর্শকাতর –
অন্য হাত আপাদমস্তক এক ক্রীতদাস প্রাণী
ফুলের মালাকে কামারশালায় নিয়ে শিকল বানানোতে সে জ্ঞানী
প্রতিদিন সূর্য যখন তার আলো বেচে শেষরাতের হাটে
সে তখন শিকলের টাই পরে নিজেকে বেচতে যায় কর্পোরেট তল্লাটে।
আমার আরেক হাত জন্ম থেকেই এথিক্যাল।
প্রতিবন্ধী শিশুর মতো গোঁয়ার – উল্টো বাতাসে একা হাঁটা তার স্বভাব।
অন্য হাত কিলবিল করছে অক্টোপাসের মতন ভয়াবহ অসংখ্য জিভে
শুষে নিতে জীবনের শুকনো মৌচাকের শেষ বিন্দু মধু। নাকি বিষ?
দেখো আমাকে সবাই দেখে রাখো ভালো করে –
আমি হলাম এই সময়ের সবচেয়ে স্মার্ট নাগরিক!

আমার এক হাত শক্ত করে ধরে রাখে প্রেমিকের হাত
যেন হাড়গুলো এক্ষুনি চিপসের মতো গুঁড়ো হয়ে যাবে।
আর অন্য হাত ভালোবেসে আলতো করে ছোঁয় শত্রুর হাত
যাতে প্রেমের একঘেয়ে বনে ঘৃণার বিরল উদ্ভিদ সে বুনে দিতে পারে
আমার এক হাত বাইরে উদারপন্থী আর ভিতরে পুরোনো তালার গরাদ
আরেক হাত নিজের আয়েশি কফিতে চুমুক দিয়ে অপরের জন্য চায় সাম্যবাদ
দেখো আমাকে সবাই দেখে রাখো ভালো করে –
আমি হলাম এই সময়ের সবচেয়ে স্মার্ট নাগরিক!
আমার স্মার্টনেসের ট্রেন চলছে মহাকালের মেরুদণ্ড ফুঁড়ে কু-ঝিক-ঝিক।

আমার এক হাত প্রিয়জনের জন্য ঝরাতে পারে ওয়াটার গানের মতো রক্ত
অন্য হাত রাষ্ট্রের চির অন্ধ, ক্রেজি ভক্ত
আমার আরেক হাত লোকাল হিরো বিরোধী, সে হতে চায় বিশ্বজনীন –
সেই হাতের রেখায় জ্বলে ঘুমন্ত মহাবিশ্বের কোটি কোটি আলোর কফিন
বন্দি সেই কফিনে বহু আলোকবর্ষ ধরে শুয়ে আছে এক প্রেত
ঈশ্বরের কসম, জীবদ্দশায় নিজেকেই শুধু সে ভালোবেসেছে অসীম তৃষ্ণায়
সমুদ্রের তৃষ্ণা যেভাবে ঝড় তোলে উপকূলের ঝাপসা রেখায়...
আমার নামই তার ডাকনাম, আমার সাথে তার চেহারার অবিশ্বাস্য মিল।
দেখো আমাকে সবাই দেখে রাখো ভালো করে –
আমি হলাম এই সময়ের সবচেয়ে স্মার্ট নাগরিক!
কিংবা সবচাইতে আনস্মার্ট ভীতু ঘোড়ার ডিম।

# পৃথিবীর ক্রেজি পথগুলো

পৃথিবীর ক্রেজি উন্মত্ত পথে
দিকভ্রান্ত সব ড্রাইভার
টানা হর্ন চেপে ছুটছে নিচু শহরতলি থেকে
ঐ উঁচু পাহাড়ে...
ভয়ানক টর্নেডো তাড়া করেছে তাদের
মালবাহী দেহ শেষ প্রলয়ের আগে
পৌঁছে দেবে মালপত্রের বোঝা
মহাজনের ক্ষুধার্ত আড়তে।
তোমাকে সাইড দেয়ার মতো মহানুভবতা
আমার নেই। ধৈর্য হারিয়ে নেমেছি
জ্যামে ঠাসা পথে, সর্বোচ্চ গতির বাসনা
নিয়ে স্টিয়ারিং, প্যাডেলে। পিছনে তাড়া করা
ঝড়ের দাপট আমার রক্তে কিন্তু রাস্তাটা
একেবারে নিথর। তাই হর্ন চাপি আর হর্ন চাপি...
কিছুই করতে পারি না তাই হর্ন চাপি।
সবার আগে যেতে চাই কিন্তু পারি না তাই হর্ন চাপি,
প্রেমহীন কুকুরের মতো জীবন তাই হর্ন চাপি,
মহাজনকে ইচ্ছা করে খুন করতে
পারি না তাই হর্ন চাপি,
সবকিছু ভেঙে ফেলতে মন চায় তাই হর্ন চাপি,
ড্রাইভিং সিট ছেড়ে ধানক্ষেতের মধ্যে গিয়ে
বসে থাকতে ইচ্ছা করে তাই হর্ন চাপি,
বেহুদা এ জীবন নিয়ে কী যে করি তাই হর্ন চাপি
ভোদাই বলেই হর্ন চাপি...
মাঝে মাঝে মনে হয় আমি নিজেই হয়ে গেছি
অন্ধ হলুদ ফড়িঙের মতো এক দানবিক ট্রাক
মধ্যরাতে যে ছুটে চলে রাস্তা পার হতে যাওয়া
বুনো হরিণীর পালকে পিষে মারার
অযৌক্তিক অভিপ্রায়ে। আর সেই খুন স্বচক্ষে দেখা
একটা জোনাকি ট্রাকের সামনে এসে উড়তে উড়তে
সম্মোহনে ভুলিয়ে আমাকেও ফেলে দেবে
কোনোদিন ভয়ানক কোনো গিরিখাদে।

## নতুন ডানার আর্তধ্বনি

তোমার সাথে আমার কোনো বিরোধ নাই,
শুধু ভালোবাসা আছে
যেমন জোনাকির সাথে কুকুরের বিরোধ নাই,
একই মাঠে তারা খেলে সন্ধ্যার ঘাসে
মায়া নামে দূরের দূরের শহরে,
অতএব চিহ্নের বিন্দুর মতো দেখা না হওয়া জীবন
যাকে জন্মাতে দেখো সেও তোমার সন্তান হয় –
সন্তান শব্দটা কেমন জানি দুঃখকাতর
আর অপরাধবোধে ভারী হয়ে রয়
গাছের শিকড়ে মাথা রেখে শুয়ে আছে সে,
যে ছিল জীবিকার হাটে কুরবানি না হওয়া নিঃসঙ্গ ঘোড়া।
গৎবাঁধা রেললাইন ধরে হাঁটোনি –
তাই পায়ে কাঁটার শিকল, ডানাগুলো কেটে নিলেও
গজায় আবার নতুন ডানার আর্তধ্বনি...

হয়তো

হয়তো আমার মায়ের হওয়ার কথা ছিল এক ডানপিটে পর্যটক। ব্যাকপ্যাক কাঁধে ঝুলিয়ে, সানগ্লাস, হ্যাট পরে এক পাহাড়ের চূড়া থেকে অন্য পাহাড়ের চূড়ায় ঈগলের মতো হানা দেওয়ার। কিংবা তুষার ঝরা তীব্র শীতের রাতে অচেনা পোড়ো হোটেলে ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে হায়েনার ডাক শোনার। কিন্তু এসব কিছু না করে সে পাহাড়ের বদলে ছাদে ওঠে এক বালতি কাপড় শুকাতে দিতে আর শীতের রাতে হায়েনার ডাক শোনার বদলে শোনে পাশে ঘুমন্ত স্বামীর নাক ডাকার আওয়াজ।

আমার বাবার হয়তো হওয়ার কথা ছিল কবি কালিদাস। কাব্যগ্রন্থের পৃষ্ঠা উল্টানোর বদলে তাকে সারা জীবন উল্টাতে হইছে টাকার বান্ডিল। জীবিকার চিড়িয়াখানায় বাঘগুলো হয়ে যায় বিড়ালের শামিল। শ্রমে, ঘামে, বাঁচার প্রয়োজনে কাব্যদেবী আর আবাস গড়তে পারেনি তার হৃদয়ে। আহত হৃদয় অ্যাটাক করেই মরতে হলো শেষমেশ। জেনে গেল, পাকস্থলীর খাদ্যের কাছে হৃদয়ের পুষ্প চিরকাল পরাস্ত এই ধরাধামে।

আর আমি? আমার হয়তো হওয়ার কথা ছিল তারার ফুল ফোটা বিশাল নীল আকাশ। নতুবা বর্ষায় উন্মত্ত সমুদ্র প্রলাপ। কিংবা চিন্তাহীন, স্বাধীন স্বাধীন রঙিন ডানার প্রজাপতি। অন্তত নিদেনপক্ষে মাটির রস, আলো বাতাস খেয়ে বহুদূর ডালপালা মেলা সতেজ বৃক্ষ। তা না হয়ে সামাজিক নার্সারির দোকানে আমি বিক্রি হয়ে গেলাম একটা জবুথবু বনসাই হিসাবে। আমার স্বপ্ন কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে ওরা ছোট করে রাখে ড্রইংরুমের শোভা যাতে আরো বাড়ে।

## ফিলিস্তিন

একটা নষ্ট ট্যাপ
তার ভিতর থেকে অবিরল
পানি ঝরে ঝরে যাচ্ছে
আসলে পানি না
ট্যাপের ভিতর থেকে ঝরছে
অশ্রুধারা...
একটা নষ্ট ট্যাপ
তার ভিতর থেকে অবিরল
পানি ঝরে ঝরে যাচ্ছে
আসলে পানি না
ট্যাপের ভিতর থেকে ঝরছে
রক্তধারা...
একটা নষ্ট পৃথিবী
তার বুড়ো মগজ থেকে অবিরল ঝরছে
পুঁজের ধারা
কিন্তু কেউ ভ্রুক্ষেপ করছে না
তুমি আমি জানালায়
প্রতিদিন দেখি
মাছরাঙা উড়ে যায় আরো একটা
ফুটফুটে মাছ ঠোঁটে
সূর্যটা খুন হয় রাত্রির কালো ছুরিতে
প্রতিদিন মৃত্যুর খবর শুনলে
তা আর জাগায় না বেদনা
প্রতিদিন হত্যাদৃশ্য দেখলে
চোখে জমে না অনাহত কান্না
আমার ফুলেল বিছানা
সব ফুল ঝেড়ে এখনই হতে পারে রণক্ষেত্র
যেখানে আমি শুয়ে আছি
আরো অনেক মৃতদেহের স্তূপে
একা আর ক্ষত বিক্ষত...
হত্যা, মৃত্যু, যুদ্ধে আমার
কখনো নীরব থাকা সাজে না
হত্যা, মৃত্যু, যুদ্ধ কখনো
ভালোবাসার পাশে না...

## একটু বেশি রাত হলে রাস্তায় একা হাঁটলে

একটু বেশি রাত হলে রাস্তায় একা হাঁটলে
রিক্সাওয়ালা গুনগুন করতে করতে সাইড না দিয়ে
গায়ের উপর উঠিয়ে দিতে চায়।
সিএনজিওয়ালা অহেতুক স্লো করে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়
কালো গাড়ির কাচ নামিয়ে ঠোঁট চাটে ধোপদুরস্ত শকুন।
চায়ের দোকানের লোকগুলোর আর পলক পড়ে না
চায়ে চুমুক দেয়ার বদলে তাদের মুখ থেকেই ঝরে তপ্ত লালা
পিছু ফিরে দেখি পিছু নিয়েছে একদল ক্ষুধার্ত হায়েনা।
একটু বেশি রাত হলে রাস্তায় একা হাঁটলে
রাস্তাটা আর রাস্তা থাকে না, হয়ে যায় প্রাগৈতিহাসিক বুনোপথ
যেখানে শিকার আর শিকারি ছাড়া কোনো মুগ্ধ প্রজাপতি ওড়ে না...
একটু বেশি রাত হলে রাস্তায় একা হাঁটলে
চাঁদ ডুবে যায়, নিভে যায় সব রোডলাইট
অন্ধকারে এগিয়ে আসে পরমাণুর মতো শত কোটি হাত –
তুমি না দেখলেও সবাই দেখে তোমার গায়ে
অদৃশ্য কালিতে লেখা 'খারাপ'।
দিনের আলোয় মুখোশ পরা সমাজ, মুখোশ খুলে
মধ্যরাতে হয় শ্বাপদসংকুল আবির্ভাব।
অরণ্যে সোনালি হরিণ! পালাও পালাও...
কসাইয়ের কাছে জোছনাও মাংসের মতো
ব্যবসার উপকরণ মনে হয়।

## মধ্যরাতে একপাল গরু

মধ্যরাতে একপাল গরু লেফট রাইট করতে করতে কসাইখানার দিকে যায় –
নিঝুম রাত, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে
পিছনে লাঠি হাতে দালাল আর সামনে প্রহরী –
তারা সবাই বোবা এবং বধির,
নিজ নিজ মনের টিভি-তে আলাদা সিনেমা চলে...
মাঝে মাঝে পাশ কাটিয়ে যায় চিৎকাররত ট্রাক
ঈশ্বরের সাম্রাজ্যে তার অনেক অভিযোগ করতে বাকি
মধ্যরাতে একপাল গরু লেফট রাইট করতে করতে কসাইখানার দিকে যায় –
আর আমি দেখি একপাল গরুও না,
একপাল মানুষ – হামাগুড়ি দিয়ে চার হাত পায়ে
নরকের শেষ দরজার দিকে ছুটে যায়।
সাইরেন বাজছে অগ্নিকাণ্ডের, ফুল আর ছুরি
পুড়ে একইরকম ছাই ছড়িয়ে আছে চারপাশে...
তাদের সাথে সাথে প্রেতাত্মার মতো যায়
সবুজ ধানক্ষেত, বিন্দু বিন্দু উড়ন্ত শিশির,
গোয়ালঘরের গন্ধ আর ধোঁয়াশায় ঢাকা কৃষক পরিবার।
একপাল গরু হয়তো না, একতাল অশ্রুর মিছিল
রাজপথে গড়াতে গড়াতে কসাইখানায় যায়...
শান্তির গোশালা খুঁজতে খুঁজতে আশ্রয় মেলে
ঝড় তুফান ভরা এক নাট্যশালায়।
পেটে তার স্বপ্নের দেবদূতের মেলে দেওয়া পাখা –
সবার অগোচরে অনাগত স্বপ্নসমেত কাবাব হবে সে
আর মৃত্যুরও অনেক পরে তার চোখ দুটো
তখনও অপলক তাকিয়ে থাকবে স্নেহকাতর...

## ডিসেম্বরের বৃষ্টি

যে সন্তানগুলো আমাকে একা পেলেই পায়ের কাছে বসে
আর বলেঃ মা খিদে পেয়েছে, একটু নুডুলস রেঁধে দাও
আমি ওদের জন্য রান্নাঘরের দিকে গেলে
ওরা যেন কোথায় আবার চলে যায়। কিন্তু কোথায় যায়
ঠিকানাটা কখনো বলে না। বাতাসের তরঙ্গে তরঙ্গে
যেমন ওদের পাই, বাতাসের ধাক্কাতেই হারাই –
বৃষ্টির রাশি রাশি ফোঁটা তবু পায় পৃথিবীর মাটির স্পর্শ
ফুলেরা পায় বৃষ্টির মুহুর্মুহু চুমু আর ওরা না ঝরা বর্ষণ হয়ে
ঘুরে বেড়ায় আকাশ থেকে আকাশে কিংবা ওই পরিযায়ী
পাখিদের মতো, যারা আমৃত্যু ডানা ভাসায় নীল মহাশূন্যে।
কারণ তুমি তো কখনো ওদের চাওনি, তুমি চেয়েছ
শুধু ওদের নাম বংশতালিকায় উল্লেখ করতে হবে বলে।
ওদের মাকেও কখনো তুমি ভালোবেসে চাওনি।
চেয়েছ শুধু ঘরে একটা নতুন আসবাবের মতো রেখে দিতে,
যে অন্যান্য আসবাবপত্রের সাথে জীবনটা কাটিয়ে দেবে।
ফলত তুমি, আমি ও আমাদের সন্তানরা সবাই পৃথকভাবে
বাস করতে থাকি দীর্ঘ ট্রেনযাত্রার মতো একটা
বিচ্ছেদের কবিতার ভিতরে। এই ডিসেম্বরের শীতল বৃষ্টিতে
হৃদয়ের কাছে জমে ওঠে গাঢ় হিমার্দ্রতা। আমি তাকে কিছুটা
উষ্ণতা দেব বলে ক্যাম্পফায়ার করতে যেতেই বনে লেগে যায়
দাবানল। একাকিত্বকে অভিশাপ ভেবে যখন থেকে
তাকে তাড়ানোর চেষ্টা করেছি, তখন থেকেই সূচনা হয়েছে
অবক্ষয়ী অসুখের। কেননা হৃদয়হীনের মতো বেঁচে থাকাই
এখন সুস্থতার পরিচায়ক। সূর্যের চারপাশে দুর্বার স্বপ্ন হয়ে বাঁচে
ভবিষ্যৎ। এখনও ওরা এসে আমার পায়ের কাছে বসে থাকে
কিন্তু আর বলে না, নুডুলস রেঁধে দাও। কিছুক্ষণ বসে থেকে
কই জানি চলে যায়। আমিও বলি না, আরেকটু থেকে যাও।
ভাবি ওদের হয়তো তাড়া থাকতে পারে অন্য কোনো
মায়ের ঘরে, অন্য কোনো বাবার আদরে জন্ম নিতে।
আমি বরং শূন্য হাত মেলে রাখি ডিসেম্বরের বৃষ্টিতে।

## ভীতু হরিণ

আমি এক ভীতু হরিণ। জন্মানোর আগে আমার মা
আমাকে জানিয়ে রাখেনি যে, পৃথিবীটা রণক্ষেত্র।
কারো মা-ই হয়তো কাউকে জানিয়ে রাখে না এ কথা।
কিন্তু জন্মানোর পরে মা বলেছিল অন্তত
জন্মসূত্রে পাওয়া এই শিং দুইটার যেন আমি যত্ন নিই
আর উপযুক্ত সময়ে তার সদ্ব্যবহার করি।
কিন্তু দেখতে বিচ্ছিরি লাগে বলে শিং দুইটা
আমি কাটিয়ে ফেলেছি পার্লারে গিয়ে। এখন আমি
অহিংস এক সুন্দরী হরিণ তরুণী –
কিন্তু প্রায়ই এমন ঘটে, শান্তির অন্বেষণে গিয়ে
নাকে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসি যুদ্ধের কোলাহল
টের পেয়ে। ডোরাকাটা শণের বনে আরাম করে
যেই একটু রোদ পোহাতে গেছি, দেখি ওমা
এ তো শণ না – দাঁতাল একটা হিংস্র বাঘ
শুয়ে আছে রোদের সাথে লেপ্টে!
শান্তি অন্বেষণে যেখানে যাই দেখি যুদ্ধের দামামা –
যুদ্ধ ভালো লাগে না তাই যুদ্ধ আর পিছু ছাড়ে না।
একা একা সমুদ্রের উপকূলে হাঁটতে বের হয়ে দেখি
কিছু লোক খেয়ালের বশে পকেট থেকে
পিস্তল বের করে একটা কুকুরকে মেরে ফেলল।
কুকুরটার রক্ত জুতায় মাড়িয়ে তারা
সূর্যাস্তের ছবি তুলতে পা ভেজাল জলে। ঠিক তখনই
আশেপাশের শত শত উদ্বাস্তু, অবহেলিত পথের কুকুর
জড়ো হয়ে এসে তীব্র চিৎকারে ধাওয়া দিল।
তাদের চিৎকার এত তীক্ষ্ণ ছিল যে,
সাগরে জোয়ারের গর্জনও হারিয়ে গিয়েছিল
কয়েক মুহূর্ত। ভীতু আমিও কখন জানি
মিলে গিয়েছিলাম সেই পথের নেড়ি কুকুরদের দলে।
আর খুব ভালো লাগছিল ওদের সাথে স্লোগান দিতে,
লোকগুলোকে চোরের মতো গাড়িতে করে
পালাতে দেখে। জীবনে প্রথম আমি উপলব্ধি করলাম,
সাগরের জোয়ারের চাইতেও জোরে গর্জন
করতে জানলে যেকোনো অধিকার অর্জন করা যায়।

## তিনটা ঠেলাগাড়ি

তিনটা ঠেলাগাড়ি সারাদিন ঠেলা ঠেলে রাতের বেলা ঘাসের উপর শুয়ে ঝিকিমিকি তারাদের সাথে ফ্লার্ট করে। কিছু তারা আবার তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আকাশ থেকে লাফিয়ে পড়ে আবেগপ্রবণ হয়ে। তারপর তাদের পরিণতি কী হয় কেউ জানে না। গুদুম গাদুম চারটা ছানা নিয়ে মা কুকুরটা ঠেলাগাড়ির নিচে আশ্রয় নেয় আর আজান শুরু হলে ছানাপোনাসহ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জুড়ে দেয়। মাথায় টাকপড়া ফিকে চুলের মতো দুই চারজন লোক নামাজ পড়তে যায়, বাকিরা টিভি-তে জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজের আইটেম সং দেখায় ব্যস্ত থাকে। অগোচরে কমলালেবুর মতো আগুনরঙা এক চাঁদ ওঠে সুপারি গাছের মাথা ভেদ করে। একটা পাখি একঘেয়েভাবে কু কু করতে থাকে। ধীরে ধীরে প্রকাণ্ড মশারির মতো কুয়াশা নামে চরাচর জুড়ে। সেই কুয়াশায় নিজেকে আমার অপার্থিব কোনো মাছ মনে হয়, যে মাছশিকারির কাছে ধরা পড়ার ভয়ে লুকিয়ে আছে তারই হাতের অভেদ্য জালে।

দূরের শহরে গুনগুন করে প্রেম। আলো আর অন্ধকার সেখানে হাত ধরে সন্ধ্যাবেলা বাড়ে, ঢোকে একই সাথে। রক্তপাত আর বিপ্লব সেখানে একই রাস্তা হাঁটে পালা করে। বৃষ্টি হলে সেই শহরে পরিচ্ছন্নতার বদলে দেখা দেয় নোংরার প্লাবন। একটা জানালা সেই শহরে সারারাত খোলা থাকে, যাতে পাশের গ্রাম থেকে কোনো জোনাকি উড়ে এলে ফিরে না যায় মন খারাপ করে। কিন্তু সেই শহরের বোবা আর্তনাদ নদী পার হয়ে আসে না এই ঠেলাগাড়ির গ্রামে।

ঠেলাগাড়ি তিনটা পরস্পরের দিকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে মাঝরাতে। দেয়ালের ওপাশের বাড়িটার বরই গাছ থেকে বরই ফুল ঝরে তাদের গায়ে আর ঝরে টুপটাপ শিশির। তখন দূর থেকে ওদেরকে দেখে মনে হয় তিনটা মহিষ হাঁটু গেড়ে ঘুমিয়ে আছে বাথানে।

আমার চিরকাল ঠেলাগাড়িগুলোকে কেন যেন মায়াবী মনে হয়, যে গাড়ির কোনো হর্ন বা ঘণ্টা নেই। মুখ বুজে এত ভার সয়ে মাল টেনে যায় কচ্ছপের মতো ধীর পায়ে। এই ধীরতার জন্য কখনো সে অ্যাক্সিডেন্ট করে না অথচ জিনিসপত্র ঠিকঠাক পৌঁছে দেয় মালিকের ঠিকানায়।

আমিও একটা ঠেলাগাড়ি যেন, অনেক মানসিক চড়াই উতরাইয়ের পথ পাড়ি দিয়ে এখানে শুয়ে আছি তারাভরা আকাশের নিচে বরই ফুলের চাদর গায়ে দিয়ে। আমি যেন আমার প্রেমিক। আমি যেন আমারই বোন। ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ লাগাতে লাগাতে ফিসফিস করে বলে, “হৃদয়কে আর কামলা দিতে পাঠিয়ো না কসাইয়ের মাংসল দোকানে।”

## শূন্যস্থানে যা যা হয়

তোমার থেকে আমি অনেক দূরে সরে গিয়েছি বলে
আমার থেকে অনেক দূরে তুমি চলে গিয়েছ বলে
আমাদের দুজনের মাঝখানের শূন্য জায়গাগুলো
ভরে গিয়েছে ক্রমাগত কালো কালো হন্তারক ডটে।

মেঘগুলো শুধুই ঘন হয় অন্ধকার ডানা ছড়িয়ে
হা-পিত্যেশ করা মরুভূমির মর্গ জুড়ে নামে না বৃষ্টি –
আকাশের থেকে আকাশ অনেক দূরে সরে গিয়েছে বলে
সেই শূন্যস্থানগুলো দখল করে নিয়েছে খরারই কৃষ্টি।

ক্রীতদাসের মরিচা ধরা লোহার জামা খুলে তুমি
কথা দিয়েছিলে নিজের গোপন সুদর্শন ডানাকে
এই ছুটিতে চলে যাবে সমুদ্রের ধারে। নৃত্যরত
ঢেউয়ের অপেরার সামনে বন্দি সেলফি মুহূর্ত।
আয়েশি নোনা জলে ভিজে তোমার কাছে খবর আসে
বহুদূরের ফেলে আসা শহরে একটা পোড়ো চিলেকোঠার
শাওয়ারের নিচে রক্তের নোনা সস মেখে পড়ে আছে
তোমারই লাশ। সারি সারি মৃত শুঁটকি মাছ চোখ খুলে
তাকিয়ে আছে সূর্যের দিকে নির্বিকার। তোমার
হৃৎপিণ্ড কেটে একটা উৎসাহী আণুবীক্ষণিক ক্যামেরা
ঢুকে যাচ্ছে গভীর থেকে আরো বেশি গভীরে।
সেখানে জীবনের সব অনুভূতির জলরং শুকিয়ে
নির্বিকার তাকিয়ে আছে একটা জ্যান্ত শুঁটকি মাছ।
তোমার থেকে তুমি অনেক দূরে সরে যাচ্ছ বলে
সেই শূন্যস্থানে ক্রমাগত টহল দিচ্ছে মৃত্যুর লংমার্চ।

ছুটির রংধনু ওঠা প্রতিটা জানালার কপাট বন্ধ –
প্রতিটা বাক্সের ফোলা ফোলা পেট খালি করে
সবাই চলে গেছে ধুলা আর ধোঁয়ার শহর ছেড়ে।
শূন্য বারান্দায় কয়েকটা চড়ুই অবিরত কথা বলে যাচ্ছে –
যেন গাড়ির হর্ন, টিভি আর মানুষের দরাদরির শব্দের অত্যাচারে
যা এতকাল তারা বলতে পারেনি, তাই বলে নিচ্ছে।
আমার থেকে আমিও আসলে অনেক দূরে সরে গিয়েছি বলে
সেই শূন্যস্থানে একটা কাঠখোট্টা বন্দুক এসে
ছোট্ট চড়ুইগুলোকে হুমকি দিচ্ছে।

## অস্তিত্বহীন ক্যামেরার সামনের চরিত্ররা

সূর্য তার ভিন্টেজ ড্রাম থেকে এমন আশ্চর্য আলো
ঢালছে আজ, যে আলোতে তোমাকে ছাড়িয়ে হু হু করে
বেড়ে চলছে তোমার ছায়া। সেই ছায়ার পায়ের কাছে
একটা অসহায় বিন্দু হয়ে তাকিয়ে আছ তুমি ক্যামেরার দিকে।
আর ছায়াটা গড়াতে গড়াতে তোমার শহর ছাড়িয়ে একসময়
পার হয়ে গেল তোমার দেশের সীমান্তের পাহারা।
তারপর আরো গড়াতে গড়াতে কয়েকটা দেশের মানচিত্রের উপর
হামাগুড়ি দিয়ে শেষমেশ ঝাঁপিয়ে পড়ল মহাশূন্যে।
যেন তোমার পায়ের সাথে বাঁধা একটা অতিশয় লম্বা কালো ফিতা
নীলাকাশ থেকে বাতাসের তোড়ে সাপের মতো ছোবল হেনে
তাকিয়ে আছে নিরীহ, বোকাসোকা পৃথিবীর দিকে।

মুখ আর মুখোশ জড়ো করে রাখা হয়েছিল
শপিং মলের চিপায় অবহেলায়। লোকটার একটা মুখোশ দরকার ছিল
কিন্তু মুখোশ শনাক্ত করতে গিয়ে বেচারা শীতের দিনেও
ঘামছিল গরমকালের মতো। কারণ সে জানত মুখোশেরা
মুখের চাইতে বেশি সরব আর আবেগপ্রবণ। কিন্তু এমন কিছু
মুখও ছিল যারা মুখোশের চাইতে বেশি স্মার্ট।
তাই মুখোশ থেকে মুখকে আলাদা করতে গিয়ে সে
দ্বিধাবিভক্ত চোখে তাকিয়ে থাকল ক্যামেরার দিকে।

একটা সুন্দরী বিড়াল আয়নায় বহুক্ষণ ধরে দেখছে নিজেকে।
আসলে সে দেখছে তারই অহমিকায় বিড়ালের প্রতিবিম্ব থেকে
রূপান্তরিত ব্যাঘ্র প্রজাতির মেরিলিন মনরোকে।
বিড়াল মনরো বাঘ মনরোর মতন অভিব্যক্তি দিয়ে
জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছে ক্যামেরার দিকে।

এ এমন অসময় যে, সময়ের গালের যত বীভৎস ব্রণ
রান্না করতে গিয়ে তেল ছিটকে ফোস্কা পড়া দাগ আর
সান বার্ন হয়ে যাওয়া ত্বক – এগুলো ঠিক করতে কোনো
বিউটিশিয়ানের প্রয়োজন পড়ে না। ফটোশপই পালন করে
এসবের নিবিড় দায়িত্ব। কদাকার সময়ের ফুলেল পোস্টার সাঁটা হয়
বাসস্ট্যান্ড থেকে জন্মান্ধ রাষ্ট্রপতির বাড়ি পর্যন্ত প্রতিটা দেয়ালে।
সেই গর্বে অন্তঃসারশূন্য সময় শূন্য চোখে পূর্ণতার পোজ দিয়ে
ভরপুর আত্মবিশ্বাসে তাকিয়ে থাকে অস্তিত্বহীন ক্যামেরার দিকে।

## ভালোবাসার বাড়ি

ভালোবাসা বাড়ি নাই কিন্তু তার বাড়িটা আসলে পড়ে আছে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী একটা ছোট্ট সাদা পুরাকীর্তি হয়ে। প্রতিদিন অসংখ্য দর্শনার্থী টিকেট কেটে বাড়িটা দেখতে আসে। দেখে ভালোবাসার ব্যবহার করা তৈজসপত্র, তার চশমা, জামা, অ্যাশট্রে – আরো অনেক কিছু। কিন্তু ভালোবাসার সাথে কারো দেখা হয় না। সে নিরুদ্দেশ হয়েছে বহু বহু কাল আগে।

সবাই তার গল্প শোনে, শুনে নানা জল্পনা কল্পনা করে। আকাশ থেকে ঝরে রূপকথার মায়াবী ডানা। ঘাসের পরে ঘাসের সবুজ আঁচল ঢেকে দেয় বালুর কংক্রিট শরীর। সন্ধ্যার শেষ কমলা আলোতে মানুষ দরজার চৌকাঠে আয়না হাতে নিয়ে ভাবে, যদি এই আয়নায় ভালোবাসার মুখটা দেখা যেত!

দূরবর্তী বোমায় মাটি কেঁপে ওঠে। কেঁপে ওঠে হৃৎপিণ্ড। কালো ধোঁয়ায় আকাশ ভরে যায়। মানুষ চেটে খায় নিজেরই পোড়া নিঃশ্বাস। খাঁচায় ময়না পাখির বদলে ঝুলে থাকে তার কালো দুই চোখ। হাতড়ে হাতড়ে অন্ধ সমুদ্র খুঁজে চলে তীরের আশ্বাস।

শুরু হয় আরেকটা নতুন দিন। চোখে চশমা রঙিন। ছাইয়ের স্তূপ থেকে মাথা বের করে মালতীলতা। তার কান্নায় বৃষ্টি নামে পোড়া পৃথিবীতে। দীর্ঘ সেই বৃষ্টিতে জমা জলে ঢেকে আছে ভবিষ্যৎ। কোথায় পা ফেললে গভীর ম্যানহোল আর কোথায় সাজানো ইটের রাস্তা। হঠাৎ ঈশ্বর হেসে ওঠে আর ভাবেঃ ভালোবাসা যদি আজ বাড়ি থাকত, তাহলে এই ধোঁয়াশা বৃষ্টির পানি গ্রাহ্য না করে সে এক দৌড়ে চলে যেত তার ভালোবাসাকে অভ্যর্থনা জানাতে পাখিদের বাসস্ট্যান্ডে।

## বুদ্ধ

মন চায় বুদ্ধ হয়ে যাই। সারাদিন আলোছায়া দোল খাওয়া অরণ্যের ভিতর সুঠাম একটা গাছের নিচে বসে বসে ভাবব আর ভাবব। ভাবনা তো দারুণ আনন্দের একটা কাজ। তুমি কী করো? আমি ভাবি। এরকম কোনো কর্মপরিচয় পেলে খুশিতে উড়তে উড়তে আমি একটা হলুদ ঘুড়ি হয়ে যেতাম।

কখনো তাকিয়ায় নবাবের আধশোয়া হয়ে থাকার মতো, কখনো পদ্মাসনে, কখনো বজ্রাসনে, কখনো আসন টাসন বাদ দিয়ে ল্যাটকা মেরে বসে থেকে, শুয়ে শুয়ে, হেঁটে হেঁটে ঘুরে ফিরে আমি শুধু ভাবতাম আর ভাবতাম। কিন্তু কী ভাবতাম? ভাবনাকে কত কত রং দেওয়া যায় তাই ভাবতাম। ভাবুক তো একজন শিল্পী। কল্পনা হলো তার তুলি, চিন্তাগুলো রং আর অনুভূতি তার অসীম ক্যানভাস।

বুদ্ধ হয়ে যেতে পারলে আমাকে আর অফিসে যাইতে হতো না। আমি তখন নিয়মিত নির্বাণের বাড়ি যাইতাম।